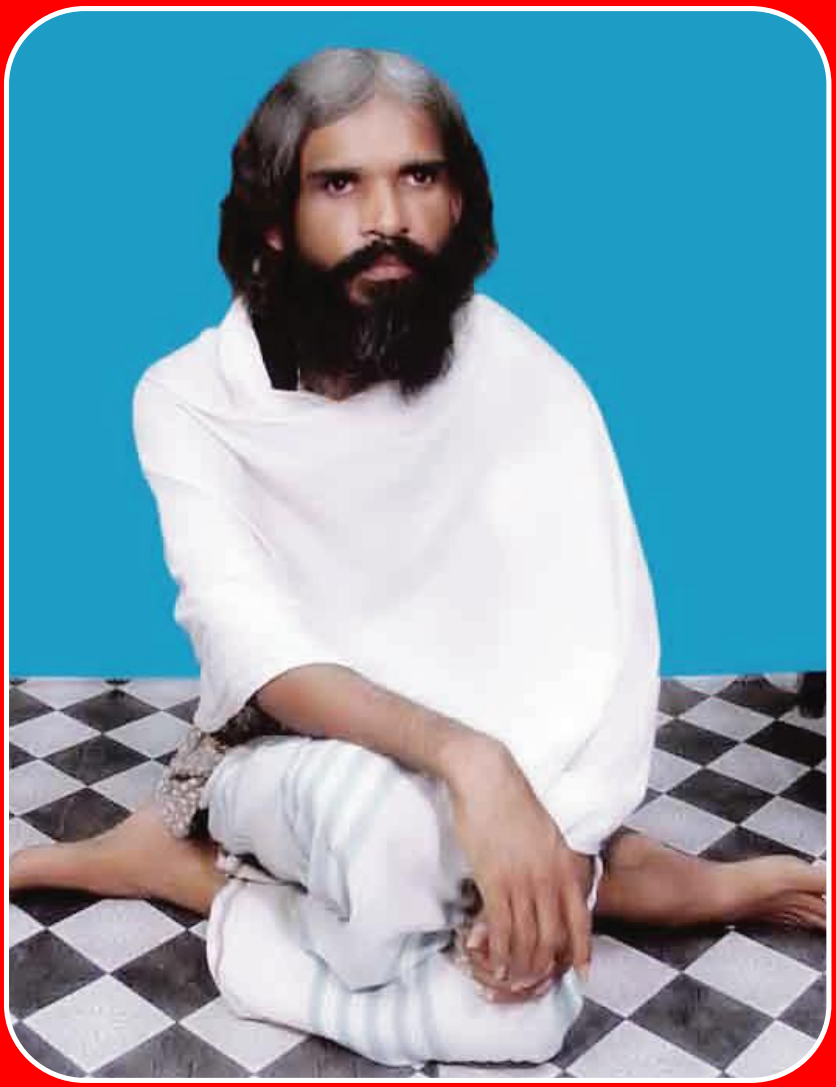

জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী • আধ্যাত্মিক বিধান

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

আধ্যাত্মিক বিধান

জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

আধ্যাত্মিক বিধান

প্রকাশনায়

সন্ধান লুঙ্গী

কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

প্রকাশক : দরবার শরীফ
পক্ষে- মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু)

স্বত্ব : মুক্ত

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৫

ষষ্ঠ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৯

পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ

প্রচ্ছদ : বাবা জাহাঙ্গীর আল-সুরেশ্বরীর ছবি

বর্ণবিন্যাস : সালাম প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ : সালাম প্রিন্টিং প্রেস, রাজা হাজী মার্কট, পাবনা।

মূল্য : **১৬০ টাকা**

প্রাপ্তিস্থান

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

যাদের জন্য এই পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছি
সেই জন্মদাতা বাবা ও মায়ের পবিত্র হস্তমোবারকে

মা- মোছাঃ দোলন চাঁপা

বাবা- মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ বিশ্বাস

একটি ঘোষনা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রিত অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবে না। কারন এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতী সত্ত্বার অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষনা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে পরিবেন।

সূচীপত্র

ভূমিকা/৫
দুইটি আয়াতের উপর আলোচনা (সুরা নূর আয়াত ৫৫-৫৬)/৬
সালাত বা নামাজ/১৬
সালাত বা নামাজের গুরুত্বের কারণ/১৬
প্রকার ভেদে নামাজ/১৮
নিম্নে সময় নির্ধারণী নামাজ উল্লেখ রইল ঃ/১৮
ধর্মের মূল বিষয় হলো কলেমা /১৯
১০৪ খানা কিতাবের পূর্ণ বিবরণঃ/২০
প্রসিদ্ধ কিতাব ৪ খানা /২০
আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দর্শনে/২১
সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা/২৫
লৌকিকতা বিবর্জীত সমাজ আহ্বান/৪১
নির্যাতন এর বর্ণনা/৬২
আপন অনুভূতি/৬২
ধর্ম/৬৩
পীর বা গুরু বিষয়ে আলোচনা/৭৩
গান বাজনা বিষয়ে/৭৬
প্রার্থনা/৮৭
স্বভাবে সূরত/৮৮
আত্ম প্রত্যয়/৯০
হাদীস/৯২
বাণী/৯২
পরিচিতি/৯৪

ভূমিকা

আধ্যাত্মিক বিধান নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল সুরেশ্বরীর দ্বিতীয় প্রকাশনা। ইতি পূর্বে আধ্যাত্মিক বিধান নামক আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছিল, যার প্রসঙ্গ ছিল ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনা এবং বর্তমান ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সাধকের অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সহজ ভাষায় আলোকপাত। উক্ত পুস্তক ক্ষুদ্র হলেও পাঠককূলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যা সাধকের জন্য ছিল আরও কিছু অবদান রাখার প্রেরণার উৎস। সেই প্রেরণা এবং মুক্তচিন্তাশীল ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল সুরেশ্বরী সম্মানিত পাঠকগণের ক্রমাগত তাগিদের ফলশ্রুতিতে সাধকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বিতীয় প্রকাশনা।

সাধকের দ্বিতীয় প্রকাশনার প্রসঙ্গ হলো, কোরআনের দুটি আয়াতের উপর গবেষণা, এবং অতি সংক্ষিপ্ত আকারে অথচ প্রাণবন্ত ও সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত আলোচনা করা এবং ইসলাম ধর্মের কলেমার বিভাজনকৃত স্তরগুলি পর্যালোচনা ও সালাতের গুরুত্ব, প্রকারভেদে সালাত এবং আসমানী কিতাব সম্পর্কীয় বিষয়াদি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা। যা চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার খোরাক হিসেবেই বিবেচিত হবে। অবশ্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সার্থক হয়েছে এমনটাও আশা করছিনা। তবে আমরা এতটুকু সান্তনা পেতে পারি যে, এই পুস্তক একটি ব্যাতিক্রমধর্মী প্রকাশনা হিসেবেই পাঠককূল গ্রহণ করবেন। ব্যাতিক্রমধর্মী বলছি এই জন্য যে, আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাদীস ও সুন্নার ধ্যান-ধারণা থেকে আমাদের এই পুস্তকের আলোচনা কিছুটা ভিন্নতর। আমাদের ধ্যান ধারণা এবং সমাজের ধ্যান-ধারণার বৈপরিত্ব থেকে সমালোচনার ঝড় উঠবে সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল আছি। আমরা আশা করছি এমনটিই ঘটুক। কারণ অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণায় ভরপুর এই তথাকথিত মুসলিম সমাজে সামান্যতম কল্যাণের বিনিময়ে হলেও যে কোন বিরূপ সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রুপকে আমরা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি মানুষ তার স্বীয় বুদ্ধির বিকাশ সাধন করুক। নিজের মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে ধর্মীয় বিধান বুঝতে শিখুক যে, ধর্মের ঠিকাদার মোল্লা-মৌলভী সাহেবদের সব কথাই অভ্রান্ত নয়। অথচ তারা মনগড়া কথার মালা সাজিয়ে ইসলামের নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অধর্মের পথে সমাজকে নিয়ে গেছে। যুগের এই চরম সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রয়াস অব্যহত থাকবে। আমরা সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থী। আল্লাহ-হাফেজ।

বিঃ দ্রঃ প্রথম প্রকাশনার সাথে দ্বিতীয় প্রকাশনার বর্ধিত প্রসঙ্গগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

দুইটি আয়াতের উপর আলোচনা

ওয়াদালাহুল্লাযিনা আমানু মিং কুম ওয়া আ মিলুস চলি–হতি লা ইয়াছ তাখ লিফান্না হুম ফিল আরদি কামাছ তাখলাফাল্লাযিনা মিং কব্লিহিম ওলা ইউমাক্কী নান্না লাহুম দ্বিনা হুমুল্লা যীর তা দো লাহুম ওলা ইউবাদ্দীলান্নাহুম মিম বাদী খওফিহিম আমনা ইয়া বুদু নানী লা ইউস রীকুনাবী শাইআ ওমাং কাফারা বা য়াদা যালীকা ফা--উলায়িকা হুমুল ফাছিকুন।

(সূরা নুর আয়াত ৫৫)

ওয়া আকীমুছছলাতা ওয়া আতুস যাকাতা ওয়া আতীয়ুর রসুলা লা আল্লাকুম তুর হামুন। (সূরা নুর আয়াত ৫৬)

সূরা নুর আয়াত ৫৫: (অর্থ) তোমাদের মধ্যে যাহারা আমানু এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন অবশ্য তিনি তাহাদিগকে দেহের ভিতরে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তী দিগকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী আমানুগণকে) প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন। এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে মাকানস্থ করিবেন। (অর্থাৎ দেহস্থ করিবেন) যেগুলি তাহাদের জন্য সন্তোষজনক করিয়াছেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে বদলাইয়া তাহাদের ভীতির পরে নিরাপত্তা দান করিবেন (তখন) তাহারা আমার দাসত্ব করিবে এবং আমার সঙ্গে কোন বিষয়ের শেরেক করিবেনা এবং উহার পরে যাহারা কুফরী করিবে তবে তাহারা প্রবৃত্তি পরায়ন।

সূরা নুর আয়াত ৫৬: (অর্থ) এবং সালাত কায়েম কর এবং জাকাত দাও এবং রসুলের অনুসরণ করো, যাহাতে তোমরা রহমত পাইতে পার।

প্রথমেই ভাবতে হবে তোমাদের মধ্যে যাহারা "আমানু" এই আমানু অর্থ যদি ঈমান আনা বুঝানো হয় তাহলে মুসলিম অধ্যুসিত পরিবারের মানব মানবী গণ প্রথমেই বলতে গেলে ঈমানের উপর থাকে কিন্তু আমানু

অর্থ ঈমান আনা এই ঈমান কি? এবং কিভাবে ঈমান আনতে হয় এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। এই ঈমান কি নিজে নিজে আনয়ন করা যায় না কি গুরু/পীর বা ইমামত প্রাপ্ত নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকটে এই প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। আহলে বায়াত নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় দলভুক্ত (মানব-মানবী) গণ এ বিষয়ে মতানৈক্য বা বিরোধপূর্ণ বাক্য বিলাপ আলেমগণের মুখে শোনবার পর তা লজ্জা জনক বলে মনে হয়। আমরা যে মতের উপর দন্ডায়মান বা যে মতের উপর ধর্মীয় বিধানকে মেনে নিয়েছি তা হল আহলে বায়াত অর্থ একজন পীরের নিকট হাজির হয়ে ঈমান আনয়ন করাকে আমানু হিসাবে খ্যাত করা হয়।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস- এই বিশ্বাস ধর্ম মতের সকল মানুষ মুখে মেনে নেয়। এখন প্রশ্ন হল যদি এভাবে মেনে নিলে ঈমানের পূর্ণতা হত তাহলে কোরানুল মাজিদে ঈমানের যে সকল বিভাজনকৃত বিশ্বাসের বাক্যগুলো দৃষ্টি গোচর হয় তাহল বেলগায়েব একিন, এলমুল একিন, আইনুল একিন, হাককুল একিন, হুয়াল একিন, এই বিশ্বাস বা একিন স্তর বিশ্বাস কি এবং তা কিভাবে পূর্ণতার অবগাহনে পৌঁছানো যায় তারই ধারা-বাহিক শিক্ষা নীতিগুলো গুরুগণ সঠিক ভাবধারায় এই সু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যা প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রকারের শিক্ষা খুঁজে পাওয়া বিরল। এখন আরো একটু ভাবনার বিষয় কোরআনুল মাজিদে উল্লেখ রয়েছে আমানু, নফস, বনী আদম, আদম, মোমিন, মুত্তাকী, বাসার, স ‘বেরীন, মুহ্সিনিন সহ বহু উন্নত পদমর্যাদার খেতাবী নাম এবং এর বিশেষণ। প্রতিটি খেতাবী নামকে আল্লাহ পাক কত সুন্দর গঠনশৈলির মানদন্ডে মর্যাদাবান করেছেন। এই মর্যাদাবান খেতাবধারী বা খেতাব প্রাপ্ত (মানব-মানবী) গণকে কে চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে তাই এই প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে হলে আধ্যাত্মিক বিষয় লাভ করা ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ আমরা জানি ইনসান শব্দের অর্থ মানুষ এত বিশেষণ মাখা শব্দের ভাব অর্থ কি মানুষ নয়? তাঁহাদের কে চিনিয়ে দেবে এই বিষয় বর্ণনার জন্য জ্ঞানীদের কাছে আবেদন রইল। কারণ এই সমস্ত বিষয় পরিস্কার এবং স্বচ্ছ না হলে সর্বসাধারণ মানুষ ভুল করে তার আমল নামায় মন্দটা স্থান করে নেয়। ফলে

অনেক আমল করবার পরও পরকালীন জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ পরিত্রানিক মুক্তির পথ বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। হয়ত দুনিয়ার জ্ঞানীগণ একদিন এই সকল চিহ্নিত ব্যবস্থা খুব শিঘ্রই মানব সমাজে ধর্মের মূল চালিকাকে সচল করতে ধর্মের সকল প্রকার বিভেদ বিড়ম্বনা অবসানের লক্ষ্যে বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। এই আমানুগণ ঈমান আনবার পরে সৎকর্ম করে (মুহসিনিন) তাহলে আল্লাহপাক ওয়াদা দিতেছেন তিনি দেহ রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন বা তাঁর (আল্লাহর) দাসদের দলভুক্ত অনুসারী করে নিবেন। কিন্তু এই সৎকর্মের বাঁধা সমুহ সম্যক বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা না থাকে তবে সমুহ ভ্রান্তি বা ভুলে নিপতিত হবার বিড়ম্বনা রয়ে যায়।
তাই সৎকর্মের বাঁধাসমুহ শয়তানের মন্দ কর্মগুলি উল্লেখ রাখলাম।

(১) উদ্দিল লানা – পথহারা করা।
(২) উমান নিয়াননা – মিথ্যা কামনা বাসনা তুলে ধরা।
(৩) ইয়ানজাগাননা – কু মন্ত্রণা দেওয়া।
(৪) নাজাগুন – প্ররোচিত করে।
(৫) আদাওয়াতা – শত্রুতা।
(৬) বাগদাআ – ঘৃণা।
(৭) আসিয়্যা – অবাধ্য।
(৮) আজনান – বিপথগামী করে।
(৯) মারেদিন – বিতাড়িত বিদ্রোহী।
(১০) ওয়াস ওয়াসা – কুমন্ত্রণা দেয়।
(১১) ইয়াফতি নাননা – প্রলুব্ধ করে।
(১২) তামাননা আলকা– নিক্ষেপ করে কামনা বাসনা।
(১৩) উলকি ফেতনাতান – ফেতনা নিক্ষেপ করে।
(১৪) ইয়া এদুকুমুল ফাকারা – দারিদ্রতার দিকে ফিরিয়ে দেয়।
(১৫) ইয়া মুরুকুম বিল ফাহসায়ে – তোমাকে হুকুম করে ফাহেসার সাথে।
(১৬) ইয়াদউ আস্ হাবিস সাইর - প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী হবার জন্য ডাকে।
(১৭) কাইদা – চক্রান্ত করে।

(১৮) ইয়ান জাগু – একের উপর অন্যকে লেলিয়ে দেয়।
(১৯) হামাজাত– পরনিন্দা প্ররোচনা, খোঁচামারা, গীবত করা।

এগুলো বর্জন পূর্বক ভাল কর্ম সম্পাদন পূর্বক সৎ কর্মশীল বলে গণ্য হওয়া যাবে। তাই আত্মার উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে সৎকর্ম সুসম্পন্ন হবে। উদাহরণ হিসাবে মহান আল্লাহপাক পূর্ববর্তী আমানুগণ এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যে, কিভাবে তাহারা দেহকে মাকানস্থ করেছিল এবং তাঁর দাস ভুক্ত হয়েছিল। অত:পর তাহাদের জন্য যা সন্তোষজনক তাহা তাহাদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। এটা মওলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি উত্তম ব্যবস্থা। অত:পর বলা হইয়াছে যে ভীতির পরে নিরাপত্তা দান করিবেন এই দান প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হলেই কেবল তাঁর (আল্লাহর) দাসভুক্ত হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

তাই মওলার পক্ষ থেকে ঘোষণা হল এই যে যিনি দাসভুক্ত হইয়া থাকবেন তিনি আর শিরক করতে পারবেন না আর যাঁরা প্রকৃত এটা না পারবেন কুফরী করবেন এদেরকে প্রবৃত্তি পরায়ন বা শয়তানী স্বত্ত্বাতে সমাসীন হয়ে মন্দ স্বভাবের করণ কার্য্য করে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা মন্দের দিকেই সমাসীন করবেন বা উপনীত হবেন।
পরের আয়াতে বলা হয়েছে সালাত কায়েম কর যাকাত দাও রসুলের অনুস্মরণ কর।
উপরের উল্লেখিত বিষয় গুলো সুসম্পন্ন হলে তাহার জন্য এই নির্দেশ নামা আর ইহা পালন করিলে রহমত পাবার ঘোষনা দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল সালাত কি ?

সালাত শব্দের অর্থ হল – নামাজ, যিকির, দরুদ, সংযোগ, যোগাযোগ, স্মরণ, কোমর দোলাইয়া নাচা, একটি বেতকে বাঁকিয়ে অর্ধবৃত্ত করা, সালাত সংরক্ষণ, মধ্যবর্তী সালাত, রুকুকারী, সেজদা আল্লাহর ইত্যাদি এক কথায় সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

এখন প্রশ্ন হল- কায়েম কি ?

কায়েম শব্দের অর্থ – প্রতিষ্ঠিত। এখন কোন কিছু প্রতিষ্ঠা বলতে চিরস্থায়ীরূপে বা স্থায়ীরূপে কার্যকর হওয়া। এখন মসজিদ দুই রকম মেজাজী ও হাকিকী–মেজাজী হল মানুষের তৈরি করা উপসনালয় আর হাকিকী হল আপন দেহতে মসজিদ তৈরি করে সালাত আদায় করা। অলিদের মতানুসারে ৪ (চার) প্রকার মসজিদ পাই।

(১) আল্লাহর মসজিদ– সর্বক্ষণ সেজদায় সমর্পনের উপযুক্ত দেহকে বলে।

(২) প্রজ্ঞার মসজিদ – ইহা মনের মধ্যে সৃষ্ট পরিবেশ যাহার মধ্যে বস্তু বিজ্ঞানী দার্শনিক বা অন্যকোন শাস্ত্রবিদ নব নব তথ্য সংগ্রহ করে এমন দেহ।

(৩) এবাদত খানা মসজিদ – ইহা একটি নির্দিষ্ট স্থান ও ঘর। যেখানে একজন শিক্ষকের শিক্ষাধীন থাকিয়া আল্লাহর মসজিদের অবস্থায় পৌঁছিবার শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে।

(৪) মসজিদে জেরার–মসজিদ ঘর শিক্ষার জন্য মিলনকেন্দ্র। যখনই আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে তখন উহাকে মসজিদে জেরার বলে।

বিস্তারিত জানতে সূফি সদর উদ্দিন আহম্মাদ চিশতি রচিত মসজিদ দর্শন বইটি পড়তে অনুরোধ রইল।

মোহ পরিপূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করবার অনুশীলনকে সালাত বলে। একটি দেহ মওলার সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা বা যোগাযোগ প্রক্রিয়াই হল সালাত। তাই এই অনুশীলন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে দেহকে মসজিদ ও তাঁর (আল্লাহর) সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে সালাত প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। এর পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দ্বারা এর সৌন্দর্য্যবর্ধন ও পরিপূর্ণ জ্ঞাপন ধর্মীয় দর্শনে সর্ব মানবের উত্তরণ যোগ্য পূর্ণতার স্বাদ আস্বাদন ও কার্য্য সম্পাদন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে সালাত কায়েম হইবে।

এই মতাদর্শকেই রসুলে পাক (সাঃ) (আঃ) তাঁর জীবন দর্শনে দেখিয়েছেন। প্রিয় পাঠক একবার ভাবুন, ৬৩ বছর জেন্দেগীতে ২৫ হইতে ৪০ এই ১৫ টি বছর বা সময় সীমা কি রসুলের জিন্দেগীর সব চাইতে উত্তম সময় কি না? যে সময়টা তিনি জাবালুল নুর পর্বত অর্থাৎ হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান করিলেন। এটার অনুশীলন প্রক্রিয়া আজ দুনিয়ার মুসলমান নামধারীগণ ভুলতে বসেছে। যদিও পীর ফকিরগণ এই অনুশীলন করার জন্য তাগিদ দেয় তাহাতে প্রচলিত বিধি যে সকল জ্ঞানীগণ আমাদের শিক্ষা দিয়া থাকে তাহারা এর বিরোধিতা করে চলছে। তাই এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন ব্যাতিরেকে কোরআনুল মাজিদে উল্লেখিত সালাত কায়েম অসম্ভব বলে মনে করি। বাবা জাহাঙ্গীর এর মুখে একটি কথা বারবার মনে পরে তা হল কাবায় শরিয়ত আর হেরা গুহায় মারেফত। তাই এই মারেফত হাসিল ব্যতিত সালাত প্রক্রিয়া পুর্ণতা অসম্ভব।

এবারে সালাতের সঙ্গে যাকাত সংযোগ স্থাপন রয়েছে। রসুল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্মীয় বিধানে আয়ের নির্ধারিত কর যা বায়তুল মালে জমা দেওয়া হতো। প্রতিদিনের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ এটাকে খুমস বলা হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধিতে মানুষের ইসলাম ধর্ম মতে বাৎসরিক আয়ের যে নির্দেশনা সদগা শতকরা ২.৫ ভাগ দেবার নির্দেশ ধনীগণ গরিব, মিসকিন, নিকট অত্মীয় প্রতিবেশি দরিদ্র হলে এদেরকে দান করবার জন্য বা যাকাত প্রদান করবার যে নির্দেশনামা আমরা পেয়ে থাকি এটা প্রশ্ন জাগে যে কোরআনুল মাজিদ আমাদেরকে কি এই যাকাত দেবার নির্দেশনা ব্যক্ত করে দেখিয়েছেন? সূফি মতে, নিজের আমিত্বের উৎসর্গকে যাকাত বলা হয়। সারাটি জীবন আমি আমি করে নিজের আমি স্বত্ত্বাকে সকল কিছুর উর্দ্ধে আমল বা কার্যকারিতায় স্থান দিলে খান্নাস স্বত্ত্বা আমার মধ্যে থাকতে মওলার সান্নিধ্য লাভ একেবারে অসম্ভব তাঁর দান কার্যকারীতা কতটুকো স্থান পেতে পারে। এখন ধনীর জন্য যাকাত গরীব এই প্রক্রিয়া থেকে দুরে অবস্থান করবে এমন বিধান খোদা তার কালাম পাকে নির্দেশ করলে সবার জন্য এক বিধান হয় কি করে? (খান্নাস, শয়তান, মরদুদ, ইবলিশ) এই মন্দ স্বত্ত্বা একটি দেহ থেকে যখন বিদুরিত হবে বা মুসলমান করানো হবে। তখন

সেই দেহটা মওলার জালুয়াতে রাঙিয়ে সালাত কায়েম প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হবে। তখনই সেই মানবটা যাকাত দানের জন্য উপযুক্ততা পায়। তখনই যাকাত দাও তার জন্য পালনীয় নির্দেশনামা কার্যকর বলে মনে করি।

এর পরে বলা হয়েছে রসুলের অনুসরণ করো। তাই রসুলের অনুসরণ অনুকরণীয় হলেই কেবল উপরোক্ত বিধি বিধান কার্যকারিতা সুসম্পন্ন হবে। এ জন্য রসুলের জীবন আদর্শকে মনে প্রাণে লালন করে তা সময় প্রেক্ষাপট ও পালনীয় বিষয় সামনে রেখে তাঁর জীবন আদর্শ একটি মানবের মুক্তির সিঁড়ি বা ধাপ হিসাবে পালনতব্য করলে তবেই তাকে অনুসরণ করা হয়। বিবেকের জিজ্ঞাসায় একবার ভাবুনতো কিছু হাদীস মুখস্ত করার পর সভ্যতার পোষাকী আবরণ দ্বারা রসুল অনুসরণ নীতি আজ গোটা সমাজ সংসার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত এটা স্থান করেছে কিনা? কোন অনুসরণ নীতি আমরা রসুলের পালনতব্য করে চলেছি এর জবাব আপন বিবেকের কাছে চাইলে পাওয়া যাবে বৈকি ? তাই রসুল অনুসরণীয় নীতি প্রতিটি মানব মানবীকে তার ক্রিয়ার কাল বা সময় এবং কার্যাবলি গুলোর সমষ্টি বিচার করে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি এবং মূল ধারা পালনীয় হলেই কেবল তা গ্রহণীয় হবে বা রসুলকে অনুসরণ করবার নির্দেশ পালন করা হবে। আর মুল ধারাতে যদি সকল কিছু পালনীয় হয় তবেই তার রহমত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা বা কালাম পাকের ঘোষণা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আর এই প্রক্রিয়া যদি সুসম্পন্ন না হয় তবে কোন কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ জন্য বলা হয়েছে “সালাত কায়েম করো”, “যাকাত দাও” এবং “রসুলের অনুসরণ করো” যাহাতে তোমরা রহমত পাইতে পার ইহা যেন পরস্পর এক সুতায় গাঁথা। একের সঙ্গে অন্যটা পরিপুর্ণ সংযোগকৃত পূর্ণতা।

আধ্যাত্মিক দর্শনে এই আমানু এবং সৎকর্ম কিন্তু কখনই বাইরের নয়। কারণ হল একটি মানব তার নিজ দেহে এর বিস্তার ঘটায় মানুষের প্রতি মানুষের ঈমান আনবার যে নীতি ইহা সর্ব সমাজ ব্যবস্থা গ্রহন করে না কিন্তু আমানুরুপে পরিগণিত হইবার চেষ্টা ও পথ দুনিয়া নামের স্থানটি উল্লেখ

করিতে হইলে দেহটাকে দুনিয়া হিসাবে উল্লেখ করিতে হয়। একটি দেহ যদি খোদা প্রাপ্তিতে সমাসিন হয় তবে সে মানবটা দেখতে আমারই মত মানব মনে হবে পার্থক্যটা কি দিয়ে বুঝব তাই জ্ঞান গর্ভের গবেষণা ব্যতীত ভাববাদ ও দর্শণবাদ আয়ত্ব না করা পর্যন্ত ইহা বুঝবার সামর্থ্য থাকেনা। উদাহরণ হিসাবে বর্তমান কোয়ান্টাম মেথড বেশ সফলতার দাবীদার। তাহলে অলিদের দর্শণ আরও ব্যাপক ও অর্থবহ হতে পারে সে সম্পর্কে বর্তমান দুনিয়া মুখ ফিরালে সমাধানটা কে দেবে ? বহু অলির জীবনে আল্লাহ প্রাপ্তির পরও কাফের টাইটেলটি দিতে (অন্ধ-কানা) শিক্ষায় শিক্ষিত বেপরোয়া জ্ঞানীগণ পিছপা হয়নি।

আরবিতে হুয়াল শব্দের অর্থ– "তিনি" এখানে শব্দটি কে যদি (হু+আল) পৃথক করা হয় তবে (সে+নির্দিষ্ট) এই নির্দিষ্টকরণ আল্লাহর ঐশী ভাবধারা ব্যতীত সর্ব সাধারণ মানব–মানবীর বুঝবার উপায় নেই। এজন্য যে মহান আল্লাহ সরাসরি কখনও প্রকাশিত বা বিকশিত হয়েছেন এর নজির বা দৃষ্টান্ত মেলানো খুবই দুরহ। তবে আধ্যাত্মিক দর্শণে অনেক অলিগণ এর নজির বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কারণ হলো আল্লাহ যখনই বিকশিত বা প্রকাশিত হয়েছে তখন তা মানবের আকারে বা মানব সুরতেই এক মাত্র তাঁর (আল্লাহ) প্রকাশ বা বিকাশ।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাবা মুনছুর হাল্লাজ বলেন, "আনাল হক" অর্থ আমিই একমাত্র সত্য। বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেন "লাইসালা ফি জুববাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা" অর্থ, আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কিছু নাই।

আবার তাঁর (আল্লাহর) হাবীব সম্পর্কে কোন কোন অলির বর্ণনা এমন যে,
"দোন হিকা শেকেল এক হায় কিসকো খোদাকাহু" অর্থ– আল্লাহ এবং
মোহাম্মদ দুই জনকেই তো একরুপে দেখি কাকে খোদা বলব?

এত কিছুর তাৎপর্য একই কথাতে দাঁড়ায় তা হল সাধক যখন তার সাধনা রাজ্যে সফলতা বা বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করে তখন সেই মানবটি আল্লাহতে সমাসীন হয়ে পূর্ণতার অবগাহনে ছুটে চলে। ইহাই আল্লাহর এক চরম লীলা খেলা সৃষ্টিতে এ এক বিস্ময়কর সংবরণ লীলা খেলে চলেছেন। "সে" প্রাপ্ত ঐশী ভাবধারাতে কোন মানব-মানবী নিজেকে মিলায়ে বা মিশ্রণ ঘটায়ে এই ধরাধামে অবস্থান করে তবে এই রহস্য বুঝিবার সাধ্য কার ? একমাত্র ভাববাদ বা আধ্যাত্মিক দর্শণে উল্লেখিত শব্দচয়নগুলির মিল বা সার্থকতা অবলোকন করা সম্ভব হয়। উক্ত আলোকপাত ধর্মীয় জ্ঞানী বা গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বা জ্ঞান গবেষণার দ্বারা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনি টুকোর সঠিক সুরাহা হবে বলে মনে করি।

যেহেতু আয়াতে কালামে প্রথমেই বলা হয়েছে তোমাদের মধ্যে যারা আমানু এবং সৎকর্ম করে তাহাদের কে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, কোরআনুল মাজিদ এমন একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ যা মানব-মানবীর মুক্তির সনদ ও মহান আল্লাহর মূল বিধি বিধানের সকল কিছু এই কিতাবে স্থান করে আছে। এমন ধর্মীয় দর্শণের জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা রইল আমানু অর্থ মানুষ, নফস অর্থ মানুষ। নফসের আবার ৩টি প্রকারন্তের বর্ণনা পাই (নফসে আম্মারা, নফসে লাউয়ামা এবং নফসে মুৎমাইন্না) এর অর্থ মানুষ এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রাখলাম মানুষ ব্যতীত মুলধারা প্রকাশ না পাওয়াতে সৃষ্ট জীবগণের আলোচনা না রাখতে শ্রেয় মনে করি। কারণ সৃষ্টজীব আল্লাহর সেফাতি রূপ বা গুণ ক্রিয়ার প্রকাশ। আর মানুষের মধ্যে জাত বা আসলের প্রকাশ।

"ইনসান" অর্থ মানুষ "মোমিন" অর্থ মানুষ
"মুত্তাকী " অর্থ মানুষ "বাসার" অর্থ মানুষ
"মোসলেম" অর্থ মানুষ "রসুল" অর্থ মানুষ
"নবী" অর্থ মানুষ "রোহবানীয়াত" অর্থ মানুষ
"অজহুল্লাহ" অর্থ মানুষ
"উলিল আমর" অর্থ মানুষ এবং "আবাদান" অর্থ মানুষ
মন্দ বর্ণনা দিতে গেলে

(১) "শয়তান" অর্থ মানুষ
(২) "মরদুদ" অর্থ মানুষ
(৩) "ইবলিশ" অর্থ মানুষ
(৪) "খান্নাস" অর্থ মানুষ
(৫) "ফাসেক" অর্থ মানুষ
(৬) "মোশরেক" অর্থ মানুষ
(৭) "মোনাফেক" অর্থ মানুষ

আরো অনেক থাকতে পারে–

উল্লেখিত মানুষের রূপ রং কার্য বিবরণী চিনিবার উপায় কর্মপন্থা এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা থাকলে দুনিয়াতে মানুষ ভ্রান্তি বা বিড়ম্বনার সম্ভাবনা কম হত। তাই জ্ঞানীদের নিকট আকুল আবেদন রইল এর সু নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে মনে করি।

কারণ শরিয়তের নিয়ম নীতি মেনে আধ্যাত্মিক দর্শন লেখনি বা বুঝানো কখনোই সম্ভাবপর নয়। যে গ্রামটিতে বসবাস করি এখানকার মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা ও বিবেকবোধ মনে হয় সেই অন্ধকার যুগের বর্বরতাকে হার মানাবে।

কি ধর্মীয় অনুভুতির আধ্যাত্মিক দর্শণ উপহার দেব। এজন্য নিজের প্রতি নিজেরই ঘৃণাবোধ জন্ম হয়। অবশ্য অল্পকিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা অন্ধের মত আমাকে ভালবাসে তাদের সেই ভালবাসা টুকোই হয়তবা বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।

সালাত বা নামাজ

সালাত- সালাত আরবী শব্দ। নামাজ ফারসি শব্দ। সালাত-এর অভিধানিক অর্থ হল সংযোগ বা যোগাযোগ মূল সালাত অর্থ সংযোগ, যোগাযোগ, দরুদ, যিকির, স্মরণ, একটি বেতকে অর্ধবৃত্ত করা, কোমর দোলাইয়া নাচা ইত্যাদি। এখন এই যোগাযোগ অর্থ হলো আল্লাহর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করাকেই সালাত বলে। যা হাকিকী বা আধ্যাত্মিক ভাবে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন হল, পবিত্র কোরানুল মাজিদে উল্লেখিত সালাত সম্পর্কে ৮২ টি আয়াতে মহান আল্লাহর সংযোগ স্থাপন এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে ।

সালাত বা নামাজের গুরুত্বের কারণ

- নামাজ আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ দান ও নিয়ামত।
- নামাজ হলো সমস্ত এবাদতের সমষ্টি।
- বান্দার সাথে আল্লাহর যোগাযোগ স্থাপনের সহজ ও সরল পথ হল নামাজ।
- আল্লাহ পাকের স্মরণই নামাজের উদ্দেশ্য।
- নামাজে আল্লাহ দর্শন হয়।
- নামাজ অন্তরকে পবিত্র করে।
- নামাজ চক্ষুকে শীতল করে।
- নামাজ এমন মূল্যবান আমল যা প্রতিষ্ঠিত করলে কোন মন্দ কাজই স্পর্শ করতে পারে না।
- নামাজ মোমিন কে মেরাজের সম্পদে সৌভাগ্যবান করে পূর্ণতা দান করে।
- নামাজ সকল সমস্যার সমাধান দাতা।
- আল্লাহ পাকের নৈকট্য প্রদানকারী একমাত্র বাহন হলো নামাজ।
- নামাজ মানুষকে মনুষত্ব দান করে।
- নামাজ আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

- নামাজ সর্বপ্রকার দুঃশ্চিন্তা দুর করে।
- নামাজ মানুষকে শান্তি দান করে।
- নামাজ সকল মন্দ স্বভাব দুর করে।
- নামাজ হলো আল্লাহ্ পাকের সাথে বান্দার সাক্ষাৎকারের মিলন ঘর।
- দোজখ হতে মুক্তির একামাত্র অবলম্বন নামাজ।
- নামাজ হলো প্রতিটি মানুষের জীবনের আত্মিক জিহাদ।
- নামাজ বান্দাকে আল্লাহর সাথে বিলীন করে দেয়।
- নামাজ আমিত্বকে ধ্বংস করে দেয়।
- নামাজ মানুষকে দুস্কর্ম হতে দূরে রাখে।
- নামাজ মানুষকে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে।
- মানুষের ভিতরে যে এলাহী শক্তি আছে নামাজ তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।
- নামাজের দ্বারা মানুষ নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি করতে সক্ষম হয়।
- নামাজ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর করে ।
- নামাজ কবরের আযাব ও কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষা করে।
- নামাজ মানুষকে সাম্যের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।
- নামাজ মানব জাতির ঐক্যের বুনিয়াদ।
- নামাজ ইহকাল ও পরকালের সকল বিপদ আপদ লাঘব করে।
- ধর্মের পূর্ণতা অর্জনে সচেষ্ট করে নামাজ।
- শয়তানি সকল ওয়াছ ওয়াছা থেকে সফল করে নামাজ।

প্রকার ভেদে নামাজ

১। সালাতে দায়েম
২। সালাতুল মেরাজ
৩। সালাতুল মাকুছ
৪। সালাতুল ওছিয়াত
৫। সালাতুল ওছতা
৬। আচ্ছামাও কাচ্ছালাত
৭। সালাতে কুন ফায়াকুন

উক্ত সালাত সকল হাকিকী।
সময় নির্ধারণী নামাজকে ওয়াক্তিয়া নামাজ বলে। এই নামাজ গুলোর মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নিহিত।

নিম্নে সময় নির্ধারণী নামাজ উল্লেখ রইল ঃ

৮। ফজর
৯। যোহর
১০। আসর
১১। মাগরিব
১২। এশা
১৩। তাহাজ্জুত
১৪। জুম্মা
১৫। তারাবিহ্
১৬। শবে কদর
১৭। শবে মেরাজ
১৮। সালাতুত্তাছবিহ্
১৯। শবে বরাত
২০। এশরাক
২১। চাশ্‌ত

২২। জওয়াল
২৩। আওয়্যাবিন
২৪। কুচ্ছুফের
২৫। খুচ্ছুফের
২৬। এছতেছকার
২৭। জানাজা (নামাজ বলে প্রচলিত)
২৮। ঈদুল ফিতর
২৯। ঈদুল আযহা
৩০। মোসাফেরের নামাজ
৩১। রুগ্ন ব্যাক্তির নামাজ
৩২। ওজুর নামাজ
৩৩। মসজিদের নামাজ
৩৪। গোসলের নামাজ
৩৫। শূকরিয়া নামাজ
৩৬। বেতের নামাজ

বিশেষ দ্রষ্টব্য আরও অনেক প্রকার নামাজ থাকতে পারে যা এখনো জানতে পারিনি এ সকল নামাজ হল সময় নির্ধারনী।

ধর্মের মূল বিষয় হলো কলেমা

এই কলেমা সম্পর্কে আক্ষরিক আলোচনা ধর্মের মূল স্বীকৃত গ্রহন বা শিকার করা বা গ্রহণ করা। এই কলেমা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত পুরুষগণ কিভাবে লাভ করেছেন ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সহিত জাগ্রত স্বত্ত্বার উপযুক্ততা নিরুপন যা আল্লাহর কর্তৃক স্বীকৃত সনদ দান করবার পর আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি হন। জাগতিক কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ইহা পাওয়া সম্ভব নয়। যুগে যুগে কালে কালে ধর্মদ্রষ্টার প্রতিনিধিগণ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) একান্ত সাধনার মাধ্যমে হেরা গুহায় ১৫ বছরের অধিক সময়

ব্যয় করেছেন। এজন্য আনুষ্ঠানিকতা ভিন্ন হতে পারে। কিন্ত মূলের ধারা যা মোরাকাবা মোশাহেদা এক ও অভিন্ন।

ধর্মের মূল সংবিধানকে কেতাব বলা হয়। ইসলাম ধর্ম মতে আসমানী বা এশী ব্যবস্থার মাধ্যমে স্রষ্টার বানী পৌঁছাইয়া দেওয়া হলো কেতাব যা কলেমা প্রাপ্তির থেকে সূচনা এজন্য বহু সাধকগণ বলেছেন জীবন্ত দেহই কিতাব। অর্থ কলেমার সৃজনী ঘটলে দেহের চৈতন্য ঘটে ঐ দেহ তখন মোবারকে রূপান্তর হয়। ইহা বিশ্ব বিধাতার এক অমোঘ লীলা। তাই মোরাকাবা মোশাহেদা এবং কলেমার পূর্ণতা ধর্মের সু-নির্দিষ্ট ধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। তাই ধর্মের সঠিক বিষয় অনুধাবন করতে হলে উল্লেখিত বিষয়ের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা অনুমেয় নয় উক্ত ব্যাবস্থাই সক্রিয় বলে বিবেচিত করলাম যদিও ইহা লেখনির মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয় তবে একটু ধারণা দিতে চেষ্টা করা।

আসামানী কিতাব মোট (১০৪) একশত চার খানা। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ (৪) চার খানা বাকী ১০০ খানা পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিলকৃত কেতাবকে সহিফা বলা হয়।

১০৪ খানা কিতাবের পূর্ণ বিবরণঃ

- ❖ হযরত আদম (আঃ) এর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- ❖ হযরত শিষ (আঃ) এর উপর ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- ❖ হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর উপর ৩০ খানা সহিফা নাজিল হয়।
- ❖ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়।

প্রসিদ্ধ কিতাব ৪ খানা

- ❖ হযরত মূসা (আঃ) এর উপর ১ খানা তাওরাত কিতাব নাজিল হয়।
- ❖ হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর ১ খানা জাবুর কিতাব নাজিল হয়।

হযরত ইশা (আঃ) এর উপর ১ খানা ইঞ্জিল কিতাব নাজিল হয়।

❖ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) এর উপর ১ খানা কোরআন মাজিদ নাজিল হয়।

বিশেষ কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ রইল যেমন ঃ

- হযরত নুহ (আঃ) এর উপর কেতাব নাই কিন্তু বোনকে বিবাহ নিষিদ্ধ তখন থেকে।
- আদম (আঃ) থেকে পশুকুল সৃষ্টি।
- ইদ্রিস (আঃ) থেকে লেখা-পড়া বস্ত্র পরিধান ব্যবস্থা শুরু।
- ইব্রাহীম (আঃ) থেকে খাৎনা, ইজার পিন্ধা ও রুটি খাওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলোর উৎপত্তি।

এখন কথা হল অনেক কিছু সমন্বয় হয়ে থাকলে তার শ্রেষ্ঠতা নিরুপন হয়। এভাবেই প্রসিদ্ধ নিরুপন। কারণ হল মূল স্বত্ত্বা এক হইতে প্রকাশ আর বিকাশ কলেমা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটু ধারণা লিখনীতে উল্লেখ রইল।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দর্শনে

মূল আলোকপাত পূর্ণ কলেমা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) (আঃ)"

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে বা ভাবলে সকল নবী রাসুলের উপর নির্ধারিত কলেমার ১ম অংশ অবিচল এবং দ্বিতীয় অংশ তাঁহার নাম সংযোজিত হয়েছে।

উদাহরণঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদম সফীউল্লাহ"

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুছা কলিমুল্লাহ ইত্যাদি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইহা অবিচল এই অংশের ভাবধারা কি সে বিষয়ে জ্ঞাত করি।

বাক্যটিকে পৃথক করে বসানো হয় (ইহা আধ্যাত্মিক)।

লা + ইলাহা + ইল্লা + আল্লাহ + হু

অর্থ : নাই + উপাস্য + ব্যতীত + আল্লাহ + সে

প্রশ্ন থাকে ৫টি ভাগে কেন ঃ রাসুল (সাঃ) এক চাদরে তিনি, আলী, মা ফাতেমা, ঈমাম হাসান ও হোসাইন একত্রে পরিবার ঘোষনা দিয়েছেন। ইহা সুফী মতে পাক পাঞ্জাতন হিসাবে পরিচিত বা জ্ঞাত। এ জন্য জাতের মূল ধারা ৫ এর বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হইল। ধারাবাহিকভাবে যত নবী ও পয়গম্বরগণ এসেছেন তাঁদের কলেমার মূল অংশ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" একই থাকে। এজন্য কলেমাকে ইসলামের জীবন বলি এবং কেতাব ও অন্যান্য গ্রন্থ সকল কিছুকে ইসলামের শরীর বলে লিখলাম তাই জীবন এবং শরীর একত্রিত করলে পূর্ণতা ঘটে। এই কলেমার অধিক গবেষণা প্রয়োজন। ধর্ম কলেমার অধিক যে বিভাজন ধর্ম মতে শুরু হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম জনতাকে আরও অধিক কলেমার উপর গবেষণার জন্য উদাত্ত আহবান রইল। মূলের ধারা সর্বদাই অক্ষুন্ন থাকে। যারা মূল বিষয় থেকে গাফেল শিখানো বুলি পাঠে ধর্মকে বুঝতে চেষ্টা করে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে না এদের দ্বারাই শান্তির ধর্ম অশান্তিতে রূপ নিতে চলেছে।

প্রথম ঃ বিভাজনকৃত কলেমা অর্থ ঃ

লা - ইলাহা- ইল্লা - আল্লাহ - হু অর্থঃ নাই - উপাস্য - ব্যতীত - আল্লাহ - সে।

দ্বিতীয় ঃ নামাজ-হাকিকী ও মেজাজীতব্য নির্ধারণকৃত ঃ

মাগরিব- আসর - যোহর - ফজর -এশা।

দায়েমি এবং অন্যান্য সালাত একান্তভাবে পীরের নিকটে জানতে হবে যা হাকিকী।

তৃতীয় ঃ ফেরেশতাগণ প্রসিদ্ধ ঃ

ইসরাফিল (আঃ), আজাজিল (আঃ), (ফেরেশতা নয়), মিকাইল (আঃ) জিবরাঈল (আঃ), আজরাইল (আঃ), হুকুম পালনে সদা কর্মে নিমগ্ন।

৪র্থ ঃ রাহা বা পথের নির্দেশ ঃ

মারেফাত, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, ওহেদানিয়াত।
এখানে পথ বলতে স্তর উচু নিচু। অর্জন বিষয়ে পরিজ্ঞাত হতে পারবে।

পঞ্চম ঃ জাতের চিহ্ন শরীরে ঃ

কান – চক্ষু – নাক–মুখ – আলজিহ্বা
ইহা জাতের বা মূলের ৫ ভাগে দেখানো হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ ঃ মোকাম ঃ

লাহুত – নাসুত – মুলকুত – জবরুত – হাহুত
জাতের মূল নিশানার সঙ্গে সমন্বয় করে মিল করলে বুঝতে সহজ হয়।

সপ্তম ঃ নফস্ ঃ

মুৎমায়িন্না – আম্বারা – লাউয়ামা – মুলহেমার – রহমানিয়া।
মানব – মানবীর – রুপান্তরিত অবস্থা বা আত্মিক – উন্নত অবস্থা।

অষ্টম ঃ আত্মা ঃ

ইনসানী – হাওয়ানী – নাবাদী – জামাদী – কুদ্মী।
কুদ্মীতে পৌঁছানো আত্মা পরম সম হয়ে থাকে।

নবম ঃ নফস ও আত্মার রং বা বর্ণ (Colour)

সবুজ – হলুদ – লাল – জরুদ – ছফেদ।

দশম ঃ রুহ যা স্বয়ং প্রভূ ঃ

নাজেলকৃত – শক্তিশালী – ফুৎকার – নিক্ষেপ – ওহি
৫ ৩ ২ ২ ৫ (ওহি, আদেশ, দাঁড়ানো,
কোরান মতে গাণিতিক সংখ্যা উল্লেখ রইল। উরুজ, পাঠানো)
মূলের বিষয়ে রুহ বিভাজন নয়।

এগার তম ঃ অজুদ বা রহস্যের ভাণ্ডার ঃ

ওহেদাল অজুদ – মোনকেনাল অজুদ – মোমতানাল অজুদ – আরেফেল অজুদ – ওরাউল ওরা অজুদ।

ইহা ব্যক্তিজন এর ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

বার তম ঃ ঈমান বা একিন এর স্তর ঃ

হাক্কোল একিন – বেলগায়েব একিন – এলমুল একিন – আয়নাল একিন – হুয়াল একিন।

ঈমানের স্তরভেদে নামকরণ হয়ে থাকে। অনুশীলন ব্যতীত জানা অসম্ভব।

তের তম ঃ আত্ম সমর্পন ঃ

ফানাফিল্লাহ – সফরদার ওয়াতেন – ফানাফিসসেখ – ফানাফিস রসুল – বাকা বিল্লাহ

চৌদ্দ তম ঃ কলেমার নাম ঃ

কলেমা তামজিদ – কলেমা তৈয়ব – কলেমা শাহাদত – কলেমা তৌহিদ, ঈমানে মুফাজ্জাল।

পনের তম ঃ পাক পাঞ্জাতনের নাম ঃ

আলী (আঃ) – মা ফাতেমা (আঃ) – হাসান (আঃ) – হোসাইন (আঃ)- রাসুল (সাঃ) (আঃ)

ষোল তম ঃ বিভাজনকৃত কলেমা অর্থ ঃ

ছিররী – রুহী – কালবী – জলী – খফী

উপরোক্ত বিন্যাস গত ভাবধারা প্রতিটি ভাগে মিল করলে বুঝতে সহজ হবে। মহানবী (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, “কলেমা তাহকিক ব্যতীত পাঠ করলে ফাসেক হইবে।” তাই তাহকিক কি এটা বুঝতে হলে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী গুনী,

ওলি পীর ফকিরদের কাছ থেকে জানতে হবে। নিজে পীরের অনুসারী তাই লিখনীতে পীরের কাছে জানতে নির্দেশনা রাখি।
পরিশেষে প্রবিত্র কলেমাতে সবাই পূর্ণতার অবগাহনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চেষ্টা করিবেন এটাই প্রত্যাশা। থাকবেনা ধর্মের কোন দলাদলি, আর বিভাজন প্রক্রিয়া। সবাই আল্লাহর সৃষ্টির মূল ধারা এক সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়ে তাঁরই সান্নিধ্যে মিলন মেলার বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হব।

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা

যুগ যুগ ধরে ধর্ম নিয়ে বিবর্তনবাদের ধর্মীয় অনুভূতি মানুষকে কাঁদিয়ে আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ধর্মের অমিয় ধারা মানুষ থেকে এলমে লাদুনী প্রাপ্ত হওয়ার পর ধর্মের মাধ্যমে এমন কি মহান অলিগণ জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন সত্য অমর, সত্য চির জীবন্ত শাশ্বত এক আমরণ বিধান, যা খন্ডণ হয় না। মুসলিম উম্মার সব চাইতে বড় আদর্শ হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)। তাঁহার জীবনটাকে আমরা একটু আলোচনা করলে সহজ হয়। আল্লাহ পাক দুনিয়ার বুকে যত নবী, রাসুল, অলিগণ এবং অবতারগণ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, মুসলিম ধর্ম মতে সব চাইতে উত্তম আদর্শ প্রতিস্থাপন করে গেছেন রাসুলে পাক (সাঃ) (আঃ)। তাঁর জীবনের ২৫ বছর বয়স কাল পর্যন্ত নিজেকে সত্যবাদিতার উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করা একমাত্র কার্য্য হিসাবে পাওয়া যায়।

তদানীন্তন আরব ভূ-খণ্ডে জাহেলিয়াতের যে করণ কার্য্য চালু ছিল সেটাকে ভূলুণ্ঠীত করার তরে যুদ্ধ অথবা দম্ভ বা গোত্র সম্প্রসারণ অথবা মানুষকে ভীতি দ্বারা ধর্মীয় বিধানকে দেখানো হয় নি। আসল কথা হল- ইহা এক আদর্শ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপন, যা দ্বারা মানুষ মুক্তির বা শান্তির একটি সিঁড়ি হিসাবে অবলম্বন পেতে পারে। আসল কথা হল- সবাই জানি- সত্য ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌও সম্ভবপর নয়। তবুও কেন জানি মিথ্যা আমাদেরকে বার বার পরাভূত করছে। হয়তবা এর সঠিক কারণ অথবা রহস্য পূর্ণ কোন বিষয় দ্বারা আমরা ক্ষতির দিকেই মনস্তাত্বিক ভাবে এগিয়ে চলেছি।

এর থেকে বাহির হওয়ার জন্য সমাজ সংসার থেকে দুরে অবস্থান নিয়ে যারা নিজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সমস্ত কিছুকে উপভোগ করে মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় সদা সর্বদা যুদ্ধরত অবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত রাখছে, এদেরকে সামাজিক ভাবে পাগল অথবা জানোয়ার হিসাবে খ্যাতি দান করেন অথবা চূড়ান্ত মেডেল কাফের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।
এই সামাজিক নিয়ম-নীতি কি আমাদেরকে সুন্দর গর্বিত শান্তির বিধান কে রূপদান করতে পেরেছে? অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কত সুন্দর ভাবে তাঁর কালাম দ্বারা জানিয়ে দিলেন– বল সত্য তোমার রব হইতে সমাগত যার ইচ্ছা হয় সত্য গ্রহণ করুক আর যার ইচ্ছা হয় সে কুফরী করুক। (সুরা কাহাফ আয়াত ২৯) এ বিষয়ে যদি আমরা কিছুটা আলোকপাত করি, তবে দেখতে পাই– দুনিয়াতে যত মানব মানবীগণ এসেছেন তাদের একটি ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপর তাহারা পরিচালিত হয়েছেন।

আখের অর্থই আমরা বুঝি পরকালীন জীবন ব্যবস্থা। মানুষ যদি বিধানকে সঠিক ভাবে আয়ত্ত্বে রাখে এবং সেই অনুযায়ী পালন করে, তাহলে তাহাকে পুরস্কৃত করা হবে। তাঁর কোন ভয় নাই বরং তাঁহার জন্য সুসংবাদ নির্ধারিত। আর যদি বিধানকে অমান্য করা হয়, নিষেধ কর্ম দ্বারা জীবনের সময়টাকে ব্যয় করা হয়, তাহলে তাহার জন্য রাখা হয়েছে কঠিন শাস্তি বা আজাব। এখন প্রশ্ন আসে যিনি আমাকে এই স্বাধীন স্বত্ত্বাতে অবমুক্ত করেছেন, তিনিই মহান আল্লাহ। আমাকে জ্ঞান থেকে শুরু করে দুনিয়াতে তাঁহারই নিয়ামত ভক্ষণের জন্য তৈরী করেছেন। তিনিই রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিচার দিবসের মালিক, তিনিই হাকিম। এটা তাঁহার জন্যই প্রযোজ্য।

একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবুন তো, পৃথিবীর মানুষ আমরা কি স্বাধীন? আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন বাঁধা নেই? সমাজ সংসার আমাদের ধর্মের ঘোষণা কি ঠিক রাখতে সচেষ্ট হয়েছে? না যারা সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে কিছু একটা অর্জন করেছেন, আল্লাহর রঙ্গে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন সমাজ সংসার মৃত্যু নামক বলী দিতেও এদের বিবেক কাঁপেনি।

এই নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতা দ্বারা কালে কালে, যুগে যুগে ধর্মীয় বিধানকে ভুলণ্ঠিত করেছে। নিজেদের দম্ভ আর অহংকার কে বড় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ফেকরা আর ফিকিরিতে বিধান কে কালে কালে, যুগে যুগে ধর্মকে দুরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর নিজেরা ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করার তরে নিজেরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে ধর্মের বারটা বাঁজাতে শুরু করেছে।

হে মানুষ বিবেক দ্বারা একটু ভাবুন না? উদাহরণ হিসাবে বলছি কোন অফিসে বা এনজিওতে বা কোম্পানিতে বা কোন মহাজন এর নিকট কাজের চুক্তিতে সম্মত হন, তাহলে প্রথমে উপযুক্ততা অনুযায়ী আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, পরে কাজ সঠিক হলে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। প্রাথমিক ভাবে কিছু ভুলত্রুটি হলে এগুলো নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হবে, তার পরেও যদি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায় তার জন্য শাস্তির বিধান দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষ সামাজিক নীতিতে কাজ কর্মে যদি এমনটা হয়, মহান আল্লাহর বিধানকে এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপীরা নিজেদের দলভূক্ত, গোচরীভূত হয়ে চালনা করার তরে, ধর্মকে ইতিহাসে কি নির্মম নিষ্ঠুরতাকে স্থান দিয়ে চলেছে। বর্বরতার এই ইতিহাস লিখে শেষ করা যাবে না। এরা কোরআন-এ ভুল অর্থ সংযোজন করতে বিবেকে ধাক্কা পায় না। হাদীসকে নিজেদের দলীয় নীতিতে ফেলতে যা নাই তাও সংযোজন আর বিয়োজন করেছে। রাসুলের হাদীসের সঙ্গে যারা বেঈমানি করতে পারে আল্লাহ পাকের কালামের সঙ্গে ভিন্ন অর্থ সংযোজন করতে পারে এরা কারা? এদের কি উপাধীতে ভূষিত করা যায়? এটা জানা নেই। আন্দাজে গুল মারার মত জ্ঞানপাপী সম্বোধন করলাম।

একটি মানুষের মৌলিক চাহিদা বিশেষ করে– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা এ বিষয় সম্বন্ধে পরিবার কেন্দ্রিক, সমাজ কেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্র কেন্দ্রিক যে উদ্যোগ তাহার সুফল প্রাপ্তি খুব কম অংশই চোখে পরার মত। বেশির ভাগ মানুষকেই দেখি নিরাপত্তার অভাব। একটি দেশের জাতি স্বত্ত্বাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে হলে প্রতিটি নাগরিকের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা

যায় দুর্বলের প্রতি সবলের খবরদারী। এখানেই শেষ নয়, ধর্মীয় আচরণ, এমনকি কথা বলার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, যা কিনা নিরীহ অবোলা মানুষ গুলোকে ব্যবহার করে নিজেকে বড় বলে জাহির করা, কিন্তু মহান আল্লাহ পাক মৃত্যু নামক ঘটনা দ্বারা এক সময় সকল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন উপেক্ষা করে এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর অবসান ঘটাইয়া দেয়। এর পরেও এ চরিত্রের অবসান হয় না। এটা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মুরুব্বী বচনে শোনা যায়, যার সামর্থ আছে সে ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক স্বীয় কর্মের প্রতিফল নিজেই আদায় করে নিতে সচেষ্ট, আর যিনি অবোলা অসহায় সে বলে আল্লাহ বিচার করবেন। এই অবস্থা থেকে মানুষকে বের করে আনতে সুফি মতাদর্শে মানুষকে বেশী উদ্বুদ্ধ হতে হবে। কারণ এ এমন একটি বিধানের পথ প্রথমেই বলা হচ্ছে যাহা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই, যেমন– ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান-আল-সুরেশ্বরীর বর্ণনা-সুফিবাদের দেশে যেতে চাও, মনে রেখ ইহা একটি তথাকথিত বাস্তবতা বর্জিত আজব দেশ। এখানে পা রাখতে হলে নিজের ইচ্ছার কাছে নিজের শক্ত মেরুদন্ডটা ভেঙ্গে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে যেতে হবে। আর সামাজিক ভাষায় টিটকারীর বিশেষণটা সর্ব প্রথম গায়ে মাখতে হবে।

এ প্রক্রিয়া বা সংজ্ঞা যদি বিবেক দ্বারা ভাবা হয়, তা হলে হয়তবা কত না ডিজাইনের মন্তব্য চালু হতে পারে যা শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি এ বিধানকে কেউ মানতে চেষ্টা করে, তাহলে ভাবুনতো এ বিষয়ে কি মন্তব্য পাওয়া যাবে? মানুষ স্বভাবতঃ একটু আরাম প্রিয় বা মোহ গ্রস্থ জীব হওয়াতে এটা পালন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা না বলে উল্টা বলে উঠবে এটা কোন বিধানই না। নিজের দোষকে আমরা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কিন্তু এ বিধি বিধানের উপর যখন সাধক তার সাধনা ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বা লাদুন্নি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁর কাছে আর ধোঁকা চলে না। সে তার উপলব্ধির দ্বারা সত্য বলে ফেলে। সত্যের কাছে যখন মিথ্যা পরাভূত হয়, তখন আবার চালাকি আর কুমন্ত্রণায় প্রলুব্ধ হয়ে সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে

দিতে চায়। যদিও এটা কখনও সম্ভব না তবুও সীমিত সময়ের জন্য হলেও শয়তানী ফাঁদে এই সফল গামী সাধকদের সমাজ সংসার বিপদগামী করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলায়ে কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান-আল-সুরেশ্বরীর বচন হল, নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ। উনার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যতীত জাগতিকের দিকে ভাবলে সমূহ ভুল হবার সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করে। অর্থাৎ যাহার জন্য সৃষ্টি ও স্রষ্টার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরী সে দিকে দৃষ্টিপাত ব্যতীত মুক্তির দিকে মানুষের পৌঁছানো সম্ভব পর নয়। যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত বিলয় যাহা ধ্বংসশীল তাহাকে আঁকড়ে ধরে আমি আপনি আমরা হানা-হানি, দলাদলীতে সরল সহজ মানুষ গুলোকে ধোঁকা আর বিপদগামী পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

অথচ বিবেকের কষাঘাতে ঐ মেকীর শৃঙ্খল হতে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এ জন্য কাকে দায়ী করতে পারি? আসল রাজ্যে কেহই দায়ী নয়। সকল দায়বদ্ধতাকে এই মানুষই কালে কালে সকল শৃঙ্খল এর বেড়ী টপকাইয়া মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। বহু অলী-আউলিয়াগণ এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে মহানবীর সেই মহামুল্যবান হাদিস খানা "মান আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ যে নিজেকে চিনলো, সে আল্লাহকে চিনলো। সব বিষয়ে মূল কথার কোন বিভাজন পাওয়া যায় না। নিজেকে চিনতে হলে খান্নাসকে বিতাড়িত করা ব্যতীত নিজেকে চেনা সম্ভব হয় না। একদা মহানবী বর্ণনা করছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান আছে।" সঙ্গে সঙ্গে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল-আল্লাহ তাহলে আপনার? আল্লাহর নবী বলিলেন হ্যাঁ আমার সঙ্গেও একজন ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি।

ইসলাম এক সাংবিধানিক বিধান, সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ্ ফেরেশতা, কেয়ামত, হাসর, মিজান, আখেরাত, বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা, মহানবীকে রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলে স্বীকার করে নেওয়া মূল লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। হে আমাদের সচেতন বিবেক একটু ভাববাদী জ্ঞান দ্বারা ভাবুন তো, কোথায় মহানবীর হাতে হাত রেখে আল্লাহকে শিকার করে রাসুলকে মেনে নেওয়া। এটা প্রকাশিত ব্যবস্থা কিন্তু নিজের সঙ্গে থাকা শয়তানকে মুসলমান বানিয়ে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করা কতটুকো যৌক্তিক। এ কারণে আমার মোর্শেদ বর বার বার একটি কথায় বুঝিয়েছেন জাহের ও বাতেনের সংমিশ্রণে ইসলাম।

আজ বিশ্বায়নের যুগে জাহের এবং বাতেনকে পৃথক করণ অবস্থা নিয়ে হানাহানি, মারামারি, দলাদলীতে ইসলাম খন্ডায়িত করতে প্রস্তুত, নাকি ইসলাম গড়তে আদর্শের বয়ান কোন ইসলামকে গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছি? একটু সচেতন বিবেকই এর সদুত্তর দিতে পারে। আবার প্রশ্ন এসে যায় এখানে তকদির এর বলয় বা খর্গ যাহা পূর্বেই নির্ধারিত। মানুষ পৃথিবীতে আগমনের বহু পূর্বেই তার অবস্থান। কার্য প্রণালী খাদ্য কর্ম চলন বলন সমস্ত কিছুই নির্ধারিত যদি এটাকে সত্য বলে মেনে নেই তাহলে আমার যত চেষ্টাই থাকুক না কেন এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে কি? আমি আমার ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যত রকমের চেষ্টা করি না কেনো, যা ঘটার সেটা ঘটবেই।

আসল কথা হল- তকদীর বিষয়ে কি নির্ধারিত সে সম্পর্কে আমার জানা নেই, এ কারণে হয়তবা সদুত্তর পাওয়া কষ্টকর। আবার এখানে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে যে সাধকগণ (মুক্তির) পথ খুঁজে চলছে উনাদের ভাষ্য হল- এই তকদীর বা ভাগ্য বলিতে যে বিধি বিধান, সেটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কারণ এই বলয় ছিন্ন করতে না পারলে মুক্তির পথ বা সত্য সম্পর্কে অচেতন অবস্থায় কালক্ষেপণ ব্যতীত আর কিছু লাভ হবে কি? এ কারণে হয়তবা ফকির বাউল বাবা লালন শাহ তাঁর গানের ভাষায় বুঝিয়েছেন- “এক কানা কয় আর এক কানারে, চল যাই মোরা ভবপারে, নিজেই কানা পথ চিনে না, পরকে ডাকে বারং বার”।

আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় টিচার বা সুপথের যারা শিক্ষক আছেন এদের কার্য বিধি ধর্মের উপদেশ আচার আচরণ কোন গণ্ডিতে

নিয়ে চলছে। সামাজিক ভাবে চলমান প্রথাকে কোন পথে টানছে প্রকৃত সত্য বা মুক্তির দিকে, না সত্যকে আড়াল করার তরে, এর জবাব কারো দেওয়া সম্ভব হবে। তবে বিবেক দ্বারা ভাবলে হয়তবা পেতে পারি, আবার নাও পেতে পারি।কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে কখনও মুক্তির গন্ধ পাওয়া দুরুহ।

তবুও একটি কথা বলে রাখা ভাল আধ্যাত্মিকতা ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যাহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক আমরা এটাকে সার্বজনীনতার সঙ্গে তুলনা করতে যেয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভেদ আর জঞ্জাল এর আবতারণা করে চলেছি। আমাদের ভাবনাটা কি এমন হতে পারে না উনার কাজটা যেহেতু ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাই উনাকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ভুলত্রুটি খুঁজে তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করি। খান্নাস, ইবলিস, শয়তান ও মরদুদ মিশ্রিত দেহে এটাকি আদৌ সম্ভব। কোন অলিই এটাকে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ খান্নাস মিশ্রিত দেহে এই উত্তরণ সম্ভব নয়।

আলাহ পাকের এ এক আজব রহস্যময় লীলা খেলাতে আমরা ছুটে চলেছি। কোথায় হাড়ের ভাঙ্গা আর কোথায় জোড়া লাগানো। বাবা লালন সাঁইজি আর একটি গানে এটাকে বুঝিয়েছেন- পাতালে চোরের বহর দেখায় আসমানের উপর তিনতারে হচ্ছে খবর শুভ-শোভন যোগ মতে" কোথায় ধর্মের মুল সূত্র আর কোথায় আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, এর সমাপ্তি খুঁজে পাওয়া দুরুহ।

এ ছাড়া কি বা বলার থাকতে পারে কারণ ধর্মের ব্যাপারে আবার লিখতে গেলে জ্ঞান পাপীদের শৃংখল এর সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে গেলে কঠোর হস্তে এর প্রতিকার, কি এক আজব দুনিয়া? এর পর মহানবী ২৫ বছর বয়সে মা খাদিজাতুল কুবরা (রা) কে বিবাহ করলেন এবং ২৫ থেকে ৪০ এই সময়ে বেশীর ভাগ সময় তিনি হেরা পর্বতের গুহায় কাটালেন। (একটানা নয় সময়ে সময়ে) এখানে ভাবনার যে বিষয় তা হল মহানবী একজন রিক্ত হত দরিদ্র বিহবল সামাজিক আচরণে বিধানকে তুলিয়া ধরলেন। যার সহায় আল্লাহ ব্যতীত নেই।

সাধনার চরম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ ভাবে নির্জনে একাকী সাধনা করতে হবে। এত ভালোবাসার স্ত্রী ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই তাকে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এ প্রসংগে আমার মোর্শেদ বর যে বাণীটা দিয়েছেন তা হল- কাবায় শরীয়ত, আর হেরাগুহায় মারেফত"। আজকের জামানায় যে সকল জ্ঞানপাপী এদের হেরা গুহার মত সাধনা নিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিচরণকে নিরেট ধোঁকাবাজীর ফাঁদে ফেলে টিটকারী আর জুলুম নির্যাতনের নজির বা দৃষ্টান্ত চোখে পরে। যেন পরকাল মুখী ধর্মের বিধান তারা আল্লাহ থেকে লিজ প্রাপ্ত হয়েছে।

এই মেকির দুনিয়াতে ফন্দি ফিকিরের আড়ালে নিজের ঈমান কে ধরে রাখা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছাড়া কি হতে পারে? এই তো সেই খান্নাসী ধোঁকা যা থেকে এই মানুষদেরকে দুরে রাখতে কত না স্টাইলের মোহতে ফাঁদ পেতে বসে আছে। যিনি এ সাধন ভজন করেননি তাকে হয়তবা বুঝানো সম্ভব না। মনে রাখতে হবে এটা খান্নাসী চালাকি। এই সাধনার শেষ স্তরে যখন মহানবী পৌঁছাইলেন, তখনই তিনি জিবরাইল ফেরেশতার দর্শন লাভ করলেন। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নবুয়্যতের উপযুক্ততার সুসংবাদ দান করা হল। এর পরেই না আল্লাহর নির্দেশে দ্বীনের প্রচার কার্য শুরু করেন। এই নবীর উম্মত হওয়ার পরও এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপী আমাদের কি শিক্ষা দেয়। এই কার্য্য বিধিকে আড়াল করে সমাজের বুকে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের মধ্য দিয়ে এরা ধর্মের প্রবক্তা সেজে এক ইসলামকে টুকরা টুকরা করে ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে মানুষকে দুরে সরাইয়া হিংসা, মারামারি, দলাদলিতে প্রতি নিয়ত সহজ সরল অবোলা মানুষগুলো জীবন দিয়ে চলেছে।

আর যারা এর থেকে মানুষকে সত্যের আহবান জানান দিচ্ছে তাদের উপর মাসলা মাসায়েলের খর্গ চাপিয়ে কি না নিষ্ঠুর বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পত্র নিয়ে আমাদের গর্ব। দুনিয়ার যত জাতি ও সম্প্রদায় তার মধ্যে বর্তমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী দল বা গোত্রতে বেশী ভাগা-ভাগি বা দলাদলি এবং কত মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে দুনিয়ার বুকে এই জ্ঞান

পাপীরা বিবেক দ্বারা একটি বারও ভাবে না। এরাই মহান বলে ঘোষণা দেয়।

মানুষের জীবন আর রক্ত নিয়ে হলি খেলতে এদের মজা আর আনন্দ, বেশীর ভাগ মানুষ আমরা আজ এদের খপ্পরে পরে ধর্মের মূল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে জঞ্জাল আর যাতনাময় জীবন ব্যবস্থার সোপান বা সিঁড়ি তৈরী করে চলেছি। এইতো আমাদের শান্তি বা আত্মসমর্পনের ধর্ম। আল্লাহ পাক মনোনীত বিধানের জাতি দুনিয়ার বুকে নিজেদের কি অবস্থান তৈরী করে চলেছে জ্ঞানীদের কে এটা হৃদয় দ্বারা ভাববার সময় এসেছে। কারণ সবাই ছেড়ে দিলে চলবে কেমনে, কাউকে না কাউকে তো ভাবতেই হবে। যদিও এখানে কথা থেকে যায় "আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কারো (কোন মানুষের) পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়"।

পাক কোরানে সুস্পষ্ট ঘোষণা সেই উপযুক্ততার জন্য তো নিজেদের চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। তকদীরে থাকলে হয়তবা হবে। যিনি ধান রোপন করতে শিখেছে তাকে দিয়েই ধান রোপন করানো হয়। আল্লাহ পাকের হুকুম প্রাপ্তির উপযুক্ততা বা যোগ্যতা অর্জন করা স্বীয় জ্ঞানের উপর আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বোধ হিসেবে বিবেচিত হবে। নবুয়ত প্রাপ্তির পরই কিন্তু মহানবী দীনের বা ইসলামের দাওয়াত প্রক্রিয়া শুরু করেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, "আদম যখন কাঁদা ও মাটিতে মেশানো তখনও আমি নবী" হাদীস তাহলে আমার মহানবী সে সকল বিধি-বিধান তাঁর জীবনীতে দেখাইয়া গেলেন। এই নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে পূর্ণতার সিঁড়িতে অবস্থান করতে হলে অনুরুপ নিয়ম অনুযায়ী বিধি-বিধান গুলো পালনীয় নয় কি? অথচ এই মুসলামান জাতি ভোগের আর সুবিধা জনক বিধান এর খণ্ডায়িত এক একটি অংশ পালনীয় বলে বাড়াবাড়ি করে, ইসলাম কে এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাইয়া দুর থেকে বহু দুরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই ধারা যদি অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে তাহলে এক সময় মানুষের সত্য সাগরে অবগাহন করার পথটি খুঁজে বের করা দুরুহ হয়ে পড়বে। এ

কারণে হয়তবা আধ্যাত্মবাদের উপর লেখনী মানুষের জন্য জরুরী হয়ে পড়ছে। হর হামেশা বাজারে প্রচলিত বই পুস্তকগুলো পড়ে বিস্মৃত হই। এই জন্য যে, সে সম্প্রদায় ভূক্ত আলেম তার কলমের লেখনী যেন তার দল বা গোত্রকে কি ভাবে বড় করে তুলে ধরা যায় এই প্রচেষ্টাই বেশী, এতে যদি কোরানের কিছু ভাবধারা পরিবর্তন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, রাসুলের সহি হাদিস এর কিছু অংশ বাদ কিছু অংশ সংযোজন করতে হলে তাতেও তাদের আপত্তি বা বিবেক দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় না। এ কারণে মানুষের আশ্রয় সত্য লাভের দৃষ্টান্ত কি লিখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়। তাহা আজ এক কঠিন সমীকরণের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ বস্তা পচা আজব সব দলিল দ্বারা সত্যকে ভুলণ্ঠিত করতে সত্যকে দূরে ঠেলে দিতে ওস্তাদ সেজে আছি। এটা বুঝবার জন্য বার বার বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়ার আশ্রয় নিলাম।

নবুয়্যতের দাওয়াত দিতে গিয়ে যখন কোন সমস্যা বা বিড়ম্বনার প্রশ্নের সম্মুখীন রাসুলে পাক (সাঃ) (আঃ) তখন এই আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষায় আছি মারফত আল্লাহ পাক সুন্দর কালাম বা বাণী দ্বারা এর সমাধান দিয়েছেন। অহির দরজা বন্ধ কিন্তু এলহাম বা আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত এ ধরনের নির্দেশনা কালাম পাকে দেখা মেলেনা। অথচ এই জামানায় বড় বড় ইসলামের জ্ঞানীগণ এই পথটার (আধ্যাত্মিকতার) প্রয়োজন নেই বলে যখন মানুষকে বুঝায় শিক্ষা দেয় এই শ্রেণীর বচন শুনতেও গভীর কষ্ট হয়।

হায়রে বিদ্যার কচকচানির শিক্ষা একটি বার নিজের বিবেক দ্বারা ভাবলাম না যে নিজে যত সময় পর্যন্ত নিজেকে চিনতে না পারবো তত সময় পর্যন্ত সে শয়তানীর কোন না কোন ধোঁকা বা মোহাবিষ্টের ফাঁদে আমিও পড়তে পারি। আর আমার ভুল শিক্ষাটা মানুষ গ্রহণ করে বিপথগামী হলে পরকালে এর জবাব মওলার কাছে কি দিব? একটি বারও আমাদের এই চিন্তা চেতনার উদয় হয় না। তাই কোন এক সাধকের গানের ভাষায় দেখলাম, 'এভাবে আর কাটবে কত কাল রে দয়াল।'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে এ সময়ের মধ্যে তিনি যাহা অর্জন করিলেন এই অর্জন এর চুড়ান্ত রূপ হল নবুয়্যতি লাভ। এত বড় অর্জনের পর যখন তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন সেই যুগে জাহেলিয়াত ও বর্বরতা তাঁর আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি বরং শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর এই দাওয়াত প্রক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থান নিয়েছেন এবং কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ পাগল হয়েছে। বর্তমান দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। সেই জাহেলিয়াতের অথবা বর্বরতার দৃষ্টান্ত। পাঠক একটু চোখ মেলে হৃদয় দ্বারা অনুধাবন করুন তো। এরকমভাবে বর্তমানেও সাধক মুনি ঋষিগণ কতনা নির্যাতন আর বঞ্চনার শিকার সহ্য করে চলছে। এ কারণে হয়তবা কোন কবি লিখেছেন 'সত্যের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।' এ রকম সহনশীলতার দৃষ্টান্ত যারা রাখতে পেরেছে তাদের কাছেই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা সত্য সাগরে অবগাহন করতে পারে তাঁদের কাছে মৃত্যু নামক যন্ত্রণাও হার মেনেছে। এভাবে বহু সাধক পুরুষের জীবনে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁরা হয়তোবা এতটুকো বুঝাইতে সক্ষম হয়েছেন যে, নিজের জীবনটা বিসর্জন গেলে সত্য যে চির জীবন্ত তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করেছেন।

দর্শন ও যুক্তি এই দুই মাত্রাকে অনেক জ্ঞানী লোকদের বয়ানে বা শিক্ষা বিষয়ক এক বানিয়ে ফেলে এটা কখনও ঠিক নয়। দর্শন যিনি লাভ করেছেন তার কাছে যুক্তি অচল, দর্শনকে যুক্তি দ্বারা আড়াল করা সম্ভব নহে। দর্শনে মেকি ধোঁকা, বাটপারী বা খবরদারিতে দর্শন পরাভূত হয় না। এছাড়াও যে বিষয়গুলো অনেক বিচারকের বিচার কার্য থেকে অন্যায়কারী মুক্তি পায়। যাহা বিচারকও বুঝতে পারে কিন্তু কিছু করার থাকে না। এখানে হয়তবা যুক্তিই মুক্তি, ইহার জাগতিক বিধি বিধানগুলো এই ভিত্তির উপর দন্ডায়মান। দর্শন ভিত্তিক যে উদাহরণ আধ্যাত্মিকতার উপরে তা এরূপ বর্ণনা দিলাম, একজন সালেক মাজজুব অলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। উনার জবানীতে একটি কথাই দু একবার উচ্চারিত হত আর তা হল 'আমিই শাহেন শাহ' অর্থাৎ আমি রাজার রাজা, মুক্ত দর্শনে এরা পূর্ণ

স্থিতি। এভাবেই যুগে যুগে কালে কালে আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করার বিদ্যা মানুষের মাধ্যম হয়ে দেহ থেকে দেহে স্থানান্তরিত প্রক্রিয়া বা অর্জন এবং স্থিতিশীলতা বা নিশ্চিত প্রাপ্তির বিধান খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সফল হতে সক্ষম হয়।

দুর্ভাগ্য বা আফসোস তাদের জন্য, যারা এদেরকে বুঝতে বা চিনতে পারে না। এর পরবর্তীতে দেখা গেল রাসুল (সাঃ) ইসলাম প্রচার কার্য শুরু করার পর সমসাময়িক সমাজ কেন্দ্রিক যে সকল ব্যক্তিগণ অসহায়, দরিদ্র, ক্ষুধা পীড়িত ও নির্যাতিত মানুষগুলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকল। তখন সমসাময়িক গোত্র প্রধান নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুরু করে বা উত্তম আদর্শের রাসুলকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। এরই এক পর্যায়ে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটাকে হিজরত বলা হয়।

মদিনার সাহাবাগণ রাসুল (সাঃ) (আঃ) কে খুবই ভালোবাসতেন। মদিনায় কিছুকাল অবস্থান করার পর রাসুলে পাক মিরাজে গমন করেন। মিরাজ থেকে আসার পর কোন কোন সাহাবা জানতে চাইলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাহলে আমাদের জন্য কি নিয়ে আসলেন? জবাবে রাসুল পাক বললেন আমি জীবনে একবার আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার উম্মত প্রতিদিন পাঁচবার সাক্ষাৎ পাবে। এজন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছি। হাদীস ও আলেমদের বয়ান অনুযায়ী। একটি বার ইসলাম নিয়ে বা ধর্ম বিষয়ে যারা গবেষণা করে চলেছেন নামাজের ব্যাপারে এতই কঠোরতা আরোপ করে চলেছেন। নামাজে আল্লাহ দর্শন কি? এই বিষয়ে দর্শনভিত্তিক নামাজ কি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পেরেছে।
একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিবেক দ্বারা ভাবুন তো কি উত্তর হতে পারে?
যদিও এই আনুষ্ঠানিক নামাজ সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এবারে বলতেই হয় আল্লাহ্ প্রাপ্তি বিষয়ে যদি দর্শন

বা দেখা নামাজ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন আর তা হল গুরু বা পীর সাহেবগণ। দর্শণ ভিত্তিক নামাজের ট্রেনিং বা শিক্ষা পদ্ধতি এদের জানা।

আর এই শিক্ষাটাই অলি-আউলিয়াগণ ভক্ত বা আশেকগণকে শিখিয়ে থাকেন যা স্বাভাবিকতার সাথে একটু কম বেশ দেখলে এটা সেটা হিয়া-হুয়া, জালিম, কাফের ও মুরতাদ বলতেও দ্বিধা করে না। আর অবস্থান অনুযায়ী একটু দুর্বল হলে নির্যাতন এর সীমা থাকে না। হায়রে ইসলামি আদর্শের বাস্তবায়ন যারা কিনা আল্লাহর ও রাসুল প্রচারিত দর্শন ভিত্তিক বিধানকে তাজা রাখছেন। দেখা বিদ্যা মানুষের মাঝে চালু রাখলেন।

কতিপয় আলেমগণ ফতুয়া আর বিদ্যার কচকচানিতে বলে বেড়ায় এসবের কোন প্রয়োজন নাই। পিতা-মাতা হল বড়পীর। তাদের মান্য করা আর ইসলামী হুকুমত গুলো পালন করলেই হবে। পীর বা গুরু ধরার কোন প্রয়োজন নাই। আফসোস যারা কিনা সঠিক বিধানের উপর মানুষকে সুশিক্ষা দিয়ে চলেছেন তারা বাদ। দুনিয়ার বুকে যত অলি, গাউছ কুতুব সহ বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত অলি-আউলিয়াগণ তাদের কি পিতা-মাতা ছিল না দুনিয়ার বুকে পিতা-মাতাকে মান্য করা থেকে দূরে থাকতে হবে এমন শিক্ষা কেউ দিয়েছেন, আমার চোখে পড়েনি। আমার মোর্শেদ বর সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হল, বাবা যদি মা-বাবা থাকে তাহলে তাদের প্রতি খেয়াল রাখিও। এই নির্দেশনা প্রথম পাই। এই বিধানকে আড়াল করবার জন্য এমন নির্দেশ কিনা তা আল্লাহ ভাল জানেন। সত্য বড়ই নির্মম বা করুণ যা ইতিহাস হতে দেখা মেলে তা হল পাক পাঞ্জাতন থেকে শুরু করে দুনিয়ার বুকে যারা সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরেছেন, তারাই কোন না কোন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বা বিদ্যার কচকচানি জ্ঞান লাভকারী দ্বারা ঘায়েল হয়েছেন। এজন্য কোন কোন কবি তার কাব্যিক ভাষায় বলে থাকেন সত্য বড়ই নির্মম।

এই তো নিজের নিকট আত্মীয় যারা আমি যতই বলি না কেন সুফির বিধানই নিরেট সত্য যাহা কখনও বিলয় প্রাপ্ত নয় কিন্তু কই কেহই তাহা মেনে নিল না। বরং যাহারা নেতৃত্বস্থানীয় কওম তাহারা কি নোংড়া চিন্তা ও এই নিরেট সত্য থেকে সরানোর জন্য কত না চালাকি আর কৌশল করে

চলেছেন। সময় সময় নিজের রক্তের প্রতি ঘৃণা লাগে। হায়রে আনুষ্ঠানিক বিধান ও লোভ মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। নিয়তির অমোঘ ঘোর তকদির এর বলয় এ কত না ঘুরপাক খাচ্ছে তার ইয়ত্তা বা চিন্তা করার মত সময়টুকু মানুষের হয় না।

এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থা উৎরায়ে মানুষ কবে সত্য লাভ করবে আল্লাহ মাবুদই হয় তো ভালো জানেন। তাহলে রাসুলে পাকের নবুয়্যতির প্রচার ও প্রসার লাভের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ সহ দীনের পথে মানুষেকে সুশিক্ষা দেবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী বা সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ পাক কোরানের এই আয়াতে কালাম দ্বারা সত্য ধর্মের সুশিক্ষাগুলো দিয়েছেন। যিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করতেন না। কোন হাদীস শরীফে এও দেখা যায় যে, "আদম যখন কাঁদা ও পানিতে মেশানো তখনও আমি নবী।"

যিনি এত বড় মর্যাদার অধিকারী হবার পরও নিজেকে পনের বছর এক মাস উনিশ দিন (একটানা নয়) সাধনা করে ঐশি বাণী লাভ করিলেন। একটু হৃদয় দ্বারা ভাবুন তো এটা আধ্যাত্মিকতা না সাধারণ পাঠশালার বিদ্যা যার ভাবনাতে যেটা সঠিক বলে মনে হবে সেটাই হয়তবা তার জন্য সঠিক। কারণ এ স্বাধীনতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। এ বিষয়টিতে অনেক অলি আউলিয়া গণের বয়ান হল কোরান পাকে এসেছে 'খাতামুন নাবি' অর্থাৎ নবী খতম হয়েছে এ কারণে অহি আর আসবে না কিন্তু এলহাম এর দরজা বন্ধ হয়নি। এই এলহাম প্রাপ্তির ব্যক্তিবর্গ হল সুশিক্ষার শিক্ষক বা কর্নধার। তাই যদি কেহ সত্য সাগরে অবগাহন করতে চায় তিনি যেন এলহাম প্রাপ্তির শিক্ষক বা পীরের অনুসরণ করে।

আজ যদি সমাজের বুকে ধর্মীয় শিক্ষকগণ সবাই এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রীতি চালু থাকত তাহলে সমাজের বুকে ধর্ম নিয়ে থাকত না কোন মারামারি মানুষে মানুষে ভুল বুঝাবুঝির শিক্ষা, এক আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত বিধি-বিধান কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত থাকতো। ফেতনা ফ্যাসাদের কোন বালাই থাকত না। আল্লাহর সঠিক বিধান গ্রহণ করে

দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ জীব এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসারীর পথে সবাই এক মহামিলনের আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করত। তাহা কতই না সুন্দর হত। এবারে মহানবী বিদায় হজ্বের ভাষণের প্রাক্কালে বলেছিলেন আজ হইতে তোমাদের জন্য ছোট যুদ্ধকে শেষ করে গেলাম, যাহা তরবারীর যুদ্ধ আর বড় যুদ্ধ রেখে গেলাম, সেটা হল নফসের সহিত যুদ্ধ। সেখানে মহানবী পাক জবানে নফসের সহিত যুদ্ধকে (জিহাদে আকবর) বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এই নফসের জিহাদ সম্পর্কে দুনিয়ায় মানুষ অচেতন। সমগ্র দুনিয়াতে যদি এই নফসের জিহাদ সম্পর্কের শিক্ষায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হইতো তাহলে সমাজের বুক থেকে অশান্তি নামক শব্দটিই থাকতো না। এ সমস্ত বিধানকে মূল হিসাবে কয়জনই বা বুঝতে পারবে। কারণ নিয়তির অমোঘ দ্বন্দ্বের শেকলে আমি আপনি বেশীর ভাগ মানুষ বন্দি। কিন্তু এই নিয়তি যে ভেঙ্গে ফেলতে পারে মানুষ। তকদিরকে ভেঙ্গে ফেলে বা দূরে সরাইয়া আল্লাহ পাকের একান্ত সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়েছে এই মানুষ। এজন্য এক সহপাঠির একটি কথা মনে পরে গেল আর তা হল 'জানা সহজ কিন্তু মানা খুবই কঠিন।' মুহূর্তের মধ্যে মানুষ চেষ্টা করে কোন বিষয় আয়ত্বে নিতে পারে আবার সেটাকে (Reback) অপর মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারে। নিজের আত্মার মধ্যে এর প্রতিফলন লাভ করতে হলে মানুষকে কি এক সু কঠিন সাধনা আর কষ্ট জ্বালা সইতে হয় যিনি এই বিষয়ের সাধক তিনিই কেবল ইহা উপলব্ধি করতে পারে। অন্য কাউকে ইহা বোঝানো কখনও সম্ভব নয় বলে মনে হয়। নিয়তির অমোঘ কি প্রকার লীলা খেলাই না মানুষের জন্য আল্লাহ তৈরী করেছেন তা তিনিই হয়তবা ভালো বলতে পারেন। ইহা বুঝবার সাধ্য কয়জনের ভাগ্যে জোটে।

এখানে হয়তবা আল্লাহ পাকের চুড়ান্ত রহিম নামের খেলাটি অবস্থান করে। হায়রে দুনিয়ার মানুষ! কি আধ্যাত্মিকতা কি বাস্তবতা আর কি শিক্ষা ব্যবস্থা ইহার সমাধান খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুরুহ। এজন্য জগতে অনেক সালেক মাজজুব অলী আছেন যারা কথা বলিতে রাজি থাকেন না বা নারাজ। পাঠকদের ভাববার জন্য বিষয়টি উল্লেখ করলাম।

নিজের নিকট আত্মীয় কি চক্রান্তের বেড়াজাল তৈরী করতে পারে, আপন রক্ত বেঈমানীর স্রোতধারা প্রবাহমান রেখেছে এ বিষয়ে যে বা যারা অমানবিক জীবন যাপন করে চলেছে তারা হয়তবা এ বিষয়ে সঠিক মতাদর্শের বর্ণনা অনায়াশে গ্রহণ করে নিতে পারবে। আর যিনি বা যারা এই হিংস্র জানোয়ারের আচরণে নিজেকে জলাঞ্জলি, কৌশল আর হিংস্রতা মেনে নিয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

এরা জগৎ সংসারের ধারাবাহিক আচরণ সম্বন্ধে কি এক হিংস্রতাকে নিজের কওম বা জাতিতে বিভেদ বিশৃংখলার শিকড় পুঁতে রাখছে যা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। অপরাধ অন্যায় থেকে বিরত থাকা এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা মানুষকে সত্যের বাণীর দাওয়াত করা যদিও বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক তবুও কেন জানি এতটুকো না লিখে বিবেককে আশ্বস্ত করতে পারলাম না এজন্যই লিখলাম।

রহীম রূপি আল্লাহ পাকের দান হল ক্ষমার পরের দান। ক্ষমা যদি কাউকে করা হয় তবে তাকে রহীম রূপ আল্লাহ করে থাকেন। কেননা ক্ষমা সার্বজনীন নয় ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্জন। এক কথায় ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তবেই সে আল্লাহ পাকের রহীম রূপ এর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। যেমন– মহান আল্লাহ পাক কালামে ঘোষণা করেছেন– "ইয়া আইয়াতুনহান নাফসিন মুতমাইন্না, ইরজিই ইলা রাব্বিকা রদিয়াতাম মারদিইয়া, ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতী।"অর্থ ঃ "ওহে পরিতুষ্ট আত্মা তুমি আমার সন্তুষ্ট ভাজন হইয়া আস; অতঃপর আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ কর, অত:পর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"ক্ষমা প্রাপ্তি না হইলে মহান স্রষ্টা কখনই আত্মাকে আহ্বান করতে পারে না। তাই সংক্ষেপে এটাকে রহীম রূপের দান বা যোগ্যতা অর্জন করা নফসকেই মহান আল্লাহ পাক আহ্বান করেছেন আর এই দানই রহীম রূপি দান বলে মনে হয়।

এটা কেউ মানতে পারে আবার কেউ নাও মানতে পাারেন। কারণ এই খানে তকদির নামক বলয় দাঁড়িয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক দর্শন এক মহা

সমুদ্রের চাইতে বড় কিছু। এটা একটা গভীর সত্য দর্শনের বিষয় যে সত্যকে আলিঙ্গণ করতে সাধকগণ দিন-রাত্র নিরলস প্রচেষ্টা গ্রহণ করে চলে। যে বা যারা এই দর্শনে বিশ্বাসী নয় এরা কিভাবে বেঁকে বসে।এটা বাস্তবে যিনি এর সাধনা করেন তিনিই কেবল ইহা উপলব্ধি করতে পারেন।

লৌকিকতা বিবর্জীত সমাজ আহ্বান

মানুষের মুক্তি পেতে সদা সর্বদা গুরু ভজন সাধন ব্যতীত আর কোন সরল পথ সাধনার জগতে নেই। এ বড় আজব এক পথ পরম প্রাপ্ত সাধকের একটু বাতাস যদি কারও লেগে থাকে তাহলে বাক্য বিলাপ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আজব লীলার বিধান যা কেবল বুঝতে পারা আর বোঝানো সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক বহন করে সৃষ্টিতে সমাসীন। আমার মোর্শেদ কেবলার বাণী "যার মধ্যে নম্রতা নেই তার জন্য সুফিবাদ হারাম" এই ঐশী বাণী নয়, সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান হল যদি কেহ আদব, দরবার নীতির দৃষ্টান্ত দেখতে চান তাহলে একবার ঘুরে আসুন এই উদাত্ত আহ্বান রইল।

কারণ হিসাবে যা পাই তা হল আমাদের সুফিবাদের সংগা ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর আল-সুরেশ্বরী লিখিত বই, সুফিবাদ আত্ম পরিচয়ের একমাত্র পথ (১ম খন্ড) বইটাতে প্রকাশ করেছেন তাহলো সুফিবাদের দেশে যেতে চাও জেনে রেখ ইহা একটি বাস্তবতা বর্জিত "আজব দেশ, এখানে পা রাখতে হলে নিজের ইচ্ছার কাছে নিজের শক্ত মেরুদন্ডটা ভেঙ্গে মেরুদন্ডহীন প্রাণী হয়ে যেতে হবে। আর সামাজিক ভাবে টিটকারীর বিশেষণটা গায়ে মাখতে হবে।" এই সংগায়ীত সুফিবাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রচলিত সমাজ সংসার এবং মানুষের রীতি নীতির কি বর্ণনা উল্লেখ করব শুধু সময়ের ক্ষেপণ ছাড়া আর কি? মানুষের জীবন ব্যবস্থা চলছে অন্যের অনুকরণ আর অনুসরণে কে কত সুখে থাকবে ভোগ বিলাসের মত্য লীলায় মাতোয়ারা যারা, তাহারাই তো সমাজটা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে 'এ যেন পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বিধান। অর্থ আর প্রাচুর্য্য যার বেশী, বেশীর ভাগ সমাজ ব্যবস্থার কর্ণধার তিনি।

অর্থ আর অস্ত্র দিয়ে তো সমাজ পরিচালনা করা যায় কিন্তু সুফিবাদ আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। আপন দেহে নিজ গুরু কে প্রতিষ্ঠিত করার তরে যিনি শুরু করেছেন তিনিই বলতে পারবেন কি বোকার স্বর্গে আমরা বসবাস করে চলেছি।একটি মানুষ তার আপন স্বত্ত্বা অর্থাৎ আত্মাকে কিভাবে চিনবে আত্মাকে কি ভাবে জানবে আত্মার পরিচয় জানার বা বোঝার জ্ঞান লাভ করার সূত্র কোন শিক্ষাতে পেতে পারে তার অন্বেষণ করবে এটা তার নিজ দায়িত্ব, "এটা তার একান্ত ধর্মের কর্ম" অথচ এ কর্মের দিকে নিজেকে কখনই ভাবনার মধ্যে আনতে চায় না। জাগতিক বিষয় বাসনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে এবং ডুবিয়ে রাখাই নয়, যে বা যারা এই আত্মতত্ত্ব জগত সংসারে প্রতি নিয়ত যুদ্ধ করে চলেছে তাদের বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি বলব এ চিন্তা চেতনা যে অমুলক এটা একমাত্র ভাববাদী মানুষ ব্যতীত অন্যের বোঝা সম্ভব নয়।

আত্ম জ্ঞান লাভের জন্য যে ফর্মূলা সেটা হল "সুফিবাদ" প্রচারিত ধর্মীয় অনুশাসন যেটা দেখতে পাই তা হল পোশাকের বাহাদুরীতে সুফির লেবাজ মানুষকে রাহুগ্রাসে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ থেকে পরিত্রাণ কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহপাক ভাল বলতে পারেন। জগত সংসারে অনেকে চুল এবং মুচ বা শরীরের অনেক অঙ্গের বিভিন্নতা সুফির আদর্শের ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায়।অনেকে আবার সুফিবাদের শিক্ষা নিতে আগ্রহী নয় কিন্তু শরীরের বিশেষ কিছু অঙ্গ যেমন লোম, চুল, মুচ এগুলোর বিভিন্নতা মানব সমাজের বুকে মেলে ধরতে রাজী। এ কারণে প্রকৃত সুফি কোন দিকে কোন মতকে অনুশাসনে নিয়ে আসবে কারণ প্রকৃত সুফি সবই বুঝতে পারে, সবই জানতে পারে, প্রকৃত সুফি রং দ্বারা নির্বাচিত করতে গেলে প্রতি পদে পদে ভূল বা বিপদগামী হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। সুফি সব সময় নিজের আত্মাকে কি ভাবে চিনবে এ বিষয় বস্তুটা যদিও আধ্যাত্মিক একটি বলয় এর শৃংখল দ্বারা আবদ্ধ একটি কর্ম যা সে নিজেই জানতে ও বুঝতে পারে অন্য নহে। এ কারণে চলমান সু-শৃংখল গতি ঠিক রাখা তার জন্য হতে পারে অস্বাভাবিক যেটা অনেকে আন্দাজ করতে পারে না।

এই বিষয়টা লেখনী দ্বারা বুঝানো কখনও সম্ভব নয়। ইহা বাস্তবে অনুশীলণের মধ্য দিয়ে নিজেকে অর্জন করে নিতে হবে। এই অনুশীলণ প্রক্রিয়া সর্ব অবস্থায় একটি গোপন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ পাক কি এক আজব লীলা খেলার উপর আমাদেরকে চালাচ্ছেন ইহা তিনিই ভাল জানেন। অথচ হাতের কাছে তিনি অবস্থান করছেন। এবং আরও উলঙ্গ করে যদি বলা হয় তা হল আমারই ভিতরে আলাহ অবস্থান করছেন। আমারই ভিতর মহান আল্লাহ পাক কে দেখা বা জাগ্রত করার চেষ্টা এই তালিম তালকিন যদি পেতে চান তা হলে ফকিরী ধারা অনুসরণ করে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতে এ এক আজব লীলা খেলা চালিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন। এ যেন স্বচ্ছ সর্ব অবস্থায় স্বাদ গ্রহণ করে চলেছেন যোগী এবং সাধকগণ যা চলমান জগত সংসারের কাউকে সে বুঝাইতে পারবে না অথচ নিজেই সর্ব অবস্থায় কি এক আজব প্রেমের নেশায় ছুটে চলে, কোন প্রকার বাঁধা তাকে আটকাতে পারেনা।

সংসার সহ সকল মায়া জাল ছিন্ন করে ছুটে চলে সেই মহান স্রষ্টার প্রেমে মাতয়ারা সদাই সে ঘুরে ফেরে আজব সকল কাণ্ড জ্ঞানহীন কর্ম পর্যন্ত তার দ্বারা ঘটে যাবে, সকল সমাজ ব্যবস্থা তাকে দোষণীয় রূপ দেখাতে বিচার করলেও তার কিছু যায় আসে না। সে তার প্রেম লীলা নিয়ে সদাই বেহুঁশ অবস্থার মধ্য দিয়ে ছুটে চলে। পূর্ণতা লাভে সক্ষম এমন একজন সাধকের সঙ্গ লাভে এ বিষয়ে কি গুরুত্ব তাহা অনুধাবন করা যায়। অথচ এ কর্ম-সুসম্পূর্ণ করতে তার বলতে আর কিছু থাকে না, জগত সংসার তাকে একটি সম্মান জনক অবস্থায় নিয়ে যায়, সেটার খেতাব হল “পাগল”।

হায়রে মানুষ সৃষ্টির সেরা অথচ একটি বার ভাববার প্রয়োজন টুকো অনুভব করল না। আমি একজন মানুষ সৃষ্টিতে কেন এসেছি আমার কর্মটাই বা কি? সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সদ্ব্যবহার করে যেতে পারলাম না এ যেন আজব ভয়ানক বিপদগামী একটি অবস্থা যা দ্বারা সৃষ্টিতে বার বার ভুল করে চলেছেন আর এই ভুলের খেসারত স্বরূপ বার বার জন্ম মৃত্যুর যাতা কলে পরে মানুষ ব্যতীত ভিন্ন জীবেও পদার্পণ হয়ে কত না যন্ত্রণার শিকার হয়ে চলেছেন, বিষয়টা কুটি মনসুরের একটি গানের কলি মনে পড়ে গেল আর তা

হল "চন্দ্র সূর্য জ্বলে নেভে সাগর কিন্তু শুকায় নারে, জন্ম মৃত্যুর রূপ ধরিয়া চালাইছেন কারবার, আমি বুঝলাম না ব্যাপার, কে বলে মানুষ মরে? মানুষ মরিলে পরে বিচার হবে কার?"

গানের এই কলি টুকো একটু নিরপেক্ষ মন দিয়া ভেবে দেখুন। যদি তকদিরে থাকে তা হলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। লৌকিক সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণ দর্শনের ক্ষেত্রে যে কত বড় বাঁধার প্রাচির হয়ে দাঁড়ায় যদি কেহ বুঝতে চেষ্টা করে তবে সে যেন কামেল গুরুর ভক্ত হয়ে সাধক রূপে একটু চেষ্টা করে উপরে উল্লেখিত বিষয়টা তাহলেই সে জানতে পারবে নচেৎ নহে। তাই লৌকিক সমাজের যারা কর্ণধার তাদের জন্য মহান আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ রইল তিনি যেন তাদেরকে হেদায়েত করেন। ইহা ছাড়া ফকিরী দর্শনে তো কোন প্রকার চাওয়া বা হিংসাত্মক কোন বিষয় সংকলিত হলে সে আবার পিছায়ে যাবে। যা শান্তির যাতাকলে পরতে পারে। প্রতিটি পথ এতই সূক্ষ যে কাগজ কলম দ্বারা ইহা বোঝানো সম্ভব নয়। আসল কথা হল বস্তু বাদ সমাজ ব্যবস্থাকেই লৌকিক বলে আখ্যায়িত করলাম যে সমাজ ব্যবস্থা চলমান রুপ ধারণ করে আছে।

এই চলমান সমাজ ব্যবস্থার কোন বিষয় নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করে সমাজের বুকে তার ভিন্ন চিত্র আমরা দেখতে পাই। সমাজ সংসার বর্হিভূত অবস্থা চোখে পরে অথচ যদি সে স্বাধীন ভাবে তার গবেষণা চালিয়ে যেতে পাড়লে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আবার কেউ কেউ বলে কিছুই হল না এখানেও সেই তকদির নামক মানদন্ডটি না পাওয়ার ঘোষণা আগেই নির্ধারণ করে বসে আছে অথচ তিনি গবেষণা নিয়ে আছেন এটাই বড় কথা। তা না হলে গবেষণার দিকে কেউ মনোনিবেশ করবে না। এজন্য সমাজ সংসারের আলোকে বড় করে দেখলাম। তাহলে গুপ্ত ভেদ রহস্য ইসলাম বিষয় নিয়ে কালে কালে (যুগে যুগে) এই মানুষ বিভিন্ন প্রকার মূল বিষয় বস্তু নিয়ে গবেষণা করে এই মানুষের মুক্তির পথের পাথেয় সহজ করে গেছেন।

আল্লাহ্ পাক অলিদের মাধ্যমে গুপ্ত ভেদ রহস্য যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান গরিমা অনুযায়ী মানুষের মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহর) রহস্য লোকের লীলা খেলা গুলো এই দুনিয়ার মানুষ যেন ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিরুপণ করে চরম বা পরম প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচন করে আত্ম তৃপ্তি লাভ করতে পারে, এ জন্য হয়তবা এই ব্যবস্থা। অথচ যিনি ইসলামের এই গুপ্ত ভেদ নিয়ে গবেষণা করে, সমাজ সংসার তার প্রতি কি নিদারুন অন্যায় আর নির্যাতন চালায় এমন কি প্রাণ নামক স্বত্ত্বাটি কেড়ে নিতেও তাদের বুক কেঁপে উঠে না। এই বিষয়গুলো ইসলামের ইতিহাস এর দিকে চোখ মেলে তাকালে একটু আন্দাজ করা যায়।

অথচ আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে ঘোষণা দিলেন সূরা কাহাফ ২৯নং আয়াত "বল, সত্য তোমার রব হইতে সমাগত যার ইচ্ছা হয় সে গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা হয় কুফরী করুক" অথচ সমাজ সংসারের এই চাপাচাপি, হিংস্রতা ও বর্বর ঘটনা প্রবাহ ঘটেই চলেছে। হায়রে মানুষ! কোথায় আল্লাহ্ পাকের স্বাধীন স্বত্ত্বার ঘোষণা আর চলমান সমাজ সংসার ঠিক বলে যাহা গ্রহণ করেছে তা থেকে যেন বিবেক দ্বারা এতটুকো ভাববার সময় মানুষের নাই। বর্বরতা হিংস্রতা চালানো বেশীর ভাগ মানুষের মত থাকে কিন্তু গবেষণার গতি কিন্তু থেমে থাকে না। কেউ না কেউ এটা আঁকড়ে ধরে থাকেন। এটাই আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মহিমা, কারণ বিধান তাঁর।

বিধান জিইয়ে রাখেন মানুষের মধ্য দিয়ে তিনিই অথচ বুঝতে না পারায় এই মানুষ কত না ভুল করে চলেছেন। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পূর্ব জন্মের কর্ম ফল অনুযায়ী তকদির পূর্বেই নির্ধারিত, তাই আমরা বেশীর ভাগ মানুষ তকদির এর বলয়ে ভুল করে চলেছি। অথচ তকদির কে রোধ করার ফর্মুলা যে পূর্ণ ফকির তিনিই শিক্ষা দিতে পারেন। সেই শিক্ষার দিকে আমরা কিছুতেই যাইতে নারাজ। সমাজ সংসার থেকে এই এক ঘেয়েমীপণা কবে দুর হবে তা আল্লাহ্ পাক ভাল জানেন। তাঁর স্বাধীন স্বত্ত্বার ঘোষণা অনুযায়ী

সমাজ সংসার কবে পরিচালিত হবে? মানুষ মুক্তির শিক্ষা নিয়ে কবে উত্তরণ হবে? সমাজ সংসার থেকে হিংস্রতা ও বর্বরতা নামক

শব্দের বিলয় ঘটবে। মানুষ দলে দলে আল্লাহর মূল বিধান অনুযায়ী জীবনটাকে পরিচালনা করবে। সেই দিন কবে আসবে হয়ত বা দেখে যাবার ভাগ্য হবে না। তবুও প্রত্যাশা রইল মানুষ যেন মুক্তির পথকে স্বাদরে গ্রহণ করে। আর এ পথ পেতে গুরুবাদ ব্যবস্থায় যেতে হবে, নইলে পাওয়া সম্ভব কিনা আমার জানা নেই।

ইসলাম অর্থ শান্তি, আসলে সমাজ সংসারে শান্তি নামক শব্দটির প্রতি নিয়ত বিলয় ঘটে চলছে। কিন্তু কেন? বিবেকের চোখ দ্বারা দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রতি নিয়ত আমরা সে সকল বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করে চলেছি। এই কঠোরতা থেকে বিভেদ বিশৃংখলার উৎপত্তি। অথচ এই কঠোরতা থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখতে পারলে সমাজ সংসার থেকে অশান্তি নামক ব্যধিটা বহুলাংশে কমে যেত। কিন্তু কেন জানি অনেক বিবেকবান ব্যক্তির এই কঠোরতা দেখে হতভম্ব হয়ে যাই।

নিরপেক্ষ মন নিয়ে এই ধর্মীয় বিধানটা পালন করতে হিমশিম খাচ্ছে। তা ছাড়া মিথ্যা পরিত্যাগ করার কথা সবারই কম বেশী জানা আছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কি কষ্টের যিনি এটাকে অনুধাবন করতে পেরেছে তাহার কাছেই সত্যের মূল্যায়ন রয়েছে। উনার ত্যাগের ও কষ্টের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা সম্পর্কে উনি জ্ঞাত। ইহা আপন দেহ মোবারকে প্রতিষ্ঠা করতে তাকে যে পরিমাণ কষ্ট সইতে হচ্ছে তা মাবুদ মওলা ভাল জানেন।

আধ্যাত্মিক দর্শনে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ আসলে এই আত্মসমর্পণ কেমন আপন আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে। সেটা কোথায় বা কার কাছে, যদি ও নিরাকার রুপি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে কেমনে। আকারেই না আত্মসমর্পণ করা যায়। নিরাকারে কোন প্রকার আত্মসমর্পণ হয় না। এ কারণে আধ্যাত্মিক দর্শনে আল্লাহকে আকার রুপে ধরা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে একই ইসলাম শব্দের রূপ রেখা দুই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা উভয়টাকে সমন্বয় করতে গেলে বেশীর ভাগ সাধকগণ আর পূর্বের বিধানকে ধরে রাখতে পারে না। তখনই অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় সমাজ

সংসারের বিধান দ্বারা, কারণ প্রচলিত বিধি বিধানের চাইতে আধ্যাত্মিক দর্শন আরও উচ্চে এবং আরও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু এটা অর্জন করতে জগত সংসারের মোহ মায়ার শিকল থেকে বেড়িয়ে আসতে হয়। এই জগত সংসারে অবস্থান করে মোহ মায়ার শিকল থেকে বের হয়ে আসা কি প্রকার কষ্টের যিনি এই সাধন প্রক্রিয়া নিজের আয়ত্বে নিয়ে সাধনা করে চলেছেন তিনিই বলতে পারেন কি এক আজব অনুভূতি কাজ করে এই প্রকারের সাধনায়। কিন্তু এই সমাজ সংসার এক নিমেষেই বর্জন করতে ফতুয়ার ঝুলি ছুড়ে মারতে এত টুকো বুক কাঁপে না। এই নিদারুণ কষ্টকে সাধক মনে প্রাণে পরিত্যাগের সিদ্ধান্তে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এখন প্রশ্ন হল সাধক এত কষ্ট মেনে নেয় কেন? কারণ সত্যের জালুয়া তার ভিতরে উদভাষণ হওয়া মাত্র তৃপ্তির কিছু নিদর্শন সে বুঝতে পারে। এর একটা আলাদা স্বাদ তার মধ্যে বিবেকের কষাঘাতে নাড়া দেয়।

এ কারণে জগত সংসার থেকে মুখ ফিরায়ে নিতে দ্বিধা দন্দ্ব তার বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই উদভাষণ প্রক্রিয়ায় মহান স্রষ্টার প্রতি যে প্রেমের উদয় ঘটে যা দ্বারা জগত সংসার আর মোহমায়া কোন কিছু দ্বারা তাকে আটকাতে পারে না। তখন সে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে জগত সংসারে চলতে আর দ্বিধা দন্দ্বে ভোগে না। তার এই ধারাবাহিক অগ্রসর হওয়ার ফলে প্রেমের পরিধি বাড়তে থাকে। এর ফলে আত্ম তৃপ্তি আরও বেড়ে যায়। ফলে শত প্রকার জুলুম আর নির্যাতন তাকে আটকাতে পারে না। সাধক তার নিজস্ব গতি নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকে। এই সমস্ত সাধকদের সমাজ সংসার বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালে তার কর্মের স্পৃহা আরও বহু গুণে বৃদ্ধি পেত। কবে সেই শুভ দিন সাধকগণ পাবে তা আল্লাহ পাক ভাল বলতে পারেন।

কারণ মানুষ আমরা তকদির নামক বলয়ে আবদ্ধ। তবুও বিবেকবান সমাজ পতিদের কাছে প্রত্যাশা রইল এই সমস্ত সাধকদের যেন স্বাধীন ভাবে কাজ করতে তারা সহায়ক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিবেচনা করেন।জগত সংসারের তুচ্ছ বিষয়ে যদি কেহ আত্মসমর্পণ করেন, দেখা যায় সে ব্যক্তির কষ্টের

সীমা-থাকে না। অথচ বিধি বিধানের আত্মসমর্পণ আরও জটিল বিষয়, এরপর দাঁড়ায় একটি আত্মাকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করাইতে কি যে কষ্ট আর যাতনা সইতে হয়, যিনি বা যাহারা এ বিষয়টার কার্য্য ভার গ্রহণের পর কর্ম সম্পাদন করেন বা করতে পেরেছেন এমন সাধু সঙ্গ লাভে বুঝতে পারা যায় যদি তকদিরে থাকে। কারণ আল্লাহপাক এই মানুষকে খান্নাস নামক শয়তান হইতে মুক্তি নেবার তরে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

অথচ এই খান্নাসের কুমন্ত্রণাতে জলাঞ্জলী দিয়ে জীবনটাকে ভুল পথে প্রেরণ করে চলেছি। আমাকে যে খান্নাস এর কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি নিতে হবে এটা ভুলে গিয়েছিলাম। তকদিরের লিখন ছিল তাই গুরু বাদে এসে এটা সম্পর্কে অবগত হলাম কিন্তু এরই মধ্যে অনেক সময় জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু এর জন্য আফছোস বা হতাশা ব্যক্ত করে কোন ফল দাঁড় করতে পারলাম না। তবুও এমন সাধক বা অলীদের প্রতি ভক্তির বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি মওলার কাছে এই একমাত্র ফরিয়াদ রইল। আর সাধন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার তরে মন বিবাগীকে সদাই রাজি করার তরে চেষ্টা যেন চালিয়ে যেতে পারি এটাই একমাত্র সম্বল। কিন্তু খান্নাস এরই মধ্যে দেহে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে, তাই এর অপসারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া হয়ে আছে।

গুরু দয়াময় তাঁর করুণা প্রত্যাশা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় দেখছিনা। তাঁরই নামে ভেলা ভাসিয়ে রাখতে পারি, এখন শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে দিন যাপন করে চলেছি। যা হোক একটু বাড়তি লিখে ফেললাম বেয়াদবী ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। শেষ কথা হল আত্মসমর্পণ মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে জগত সংসারকে দূরে সরায়ে এই জগত সংসারে অবস্থান করে, আত্মসমর্পণ কারী রূপে নিজেকে আপন দেহ কাঠামোতে রূপ দান করতে পারলে আত্মসমর্পণ কারী রূপে প্রকাশ পায়। এটাই খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় লওয়া বা মুক্তি নেওয়া। এ কাজটা সুসম্পন্ন করতে পারলে হয় পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, যিনি এ কার্যে সফলতা লাভ করেন, তার কাছ থেকে ইসলাম নামক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকৃত বিধান সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারা যায়। আর এ কার্য সম্পন্ন কারীই হয় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ধারক এবং বাহক। এমন ব্যক্তিকে গুরু রূপে পাওয়া ভাগ্যের এক চরম প্রাপ্তি।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে কেন দুনিয়াতে পাঠাইয়েছেন? উত্তরে পাওয়া যায় তাঁর দাসত্বের জন্য, কোন কোন মতে তাঁর ইবাদত বা বন্দেগীর জন্য। অথচ এই ইবাদত বন্দেগী আর দাসত্ব নিজের মনে করে প্রতিনিয়ত খান্নাসের ধোঁকায় পরে সমাজ সংসারের যাতনা ও চাপে পড়ে লোক দেখানো ইবাদত বন্দেগীতে মেতে রইলাম একটি বারের তরে বিবেকের কষাঘাতে ভাবনাকে জাগ্রত রূপ ধারণ করে দেখতে চেষ্টা করি না। এই মোহ মায়া জালে নিজেকে অদৃশ্য শৃংখলাতে এমনই আবদ্ধ হলাম, এটাকেই একমাত্র বিধান বলে পালন করে গেলাম, আমার ইবাদত বা বন্দেগী যে, আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পৌঁছায় না, এটা একটি বারও ভেবে দেখলাম না। কোরআন কত সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন "রব বলিলেন, একা ডাকো, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে" অর্থাৎ খান্নাস মিশ্রিত দেহ সর্বদাই দুই এর অবস্থান এই দুই এর অবস্থানে আল্লাহ পাকের আরাধনা বা বন্দেগী কবুল হবার নয়।

এ কারণে সুফি সাধকগণ এই খান্নাস হতে মুক্তি নেবার ঘোষণা এবং কিভাবে এই দেহ থেকে খান্নাসকে সরাইতে হবে এ ফর্মূলা দিয়ে থাকেন। আপন দেহ থেকে খান্নাসকে বিতাড়িত করতে পারলেই একা হওয়া যায়। আর এই একা হবার পর আল্লাহ্ পাককে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব কোরআন পাক ঘোষণা করেছেন। পূর্বের যুগের মনি ঋষিগণ মায়াকে খান্নাস বলে অভিহিত করেছেন।

মোহমায়ার জগত সংসারে জন্ম লাভের পর থেকে একজন মানুষ নিজের নফসকে মায়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বড় হতে থাকে। এটাই প্রতিটি মানুষের জন্মগত একটি বলয়ে আবদ্ধ তকদির। এই তকদির নামক বলয় থেকে বের হয়ে আসা সহজ কোন বিষয় না। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নফস যে মায়াকে সূফিজম বুঝবার পূর্ব পর্যন্ত সে এই জগত সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের অবস্থান গড়ে। কিন্তু সুফিজম আয়ত্বে নেবার পর এই নফস্ হতে মোহ মায়াকে দূরে সরাতে না পারলে খান্নাস দুর্বল হতে পারে না। আর খান্নাস দুর্বল না হলে ধর্মীয় বিধান দর্শন ভিত্তিক কোন দৃষ্টান্ত ধর্মীয় অনুভূতিতে দেখা মেলে না। এই দেখা না মিললে একিন বা বিশ্বাসের কোন মূল্য থাকে না।

সুফিবাদ বা গুরু প্রেমে যদি দর্শন না মেলে তবে তা ফকিরী লাইন হবে না, তা হয় ফিকিরী জীবনের অধিক সময় ফিকিরী করে সময় হারিয়ে ফেললাম। কেননা এই মোহ মায়ার জগতে পদার্পণ এর পর থেকে নফস বা আত্মার সঙ্গে মিশে আছে এই মায়া জীবনে এই মায়াতে ডুবে রইলাম। অনেককে এই মোহ মায়া ছেড়ে মুক্ত হবার নির্দেশ দিয়ে থাকি কিন্তু নিজেও এই মোহ মায়াতে ডুবে রইলাম, এর থেকে উত্তরণ হতে চেষ্টা করেও বার বার পরাজিত সৈনিক হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মেখে সাধুর বেশ ভূষণে মানুষকে ঠকানোর পাঁয়তারা করে চলেছি। এটা অনুধাবন করার পরও উত্তরণ করার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইহা লাভ করতে পারছি না, তাই গুরু দয়াময় যদি একটু সু-দৃষ্টি দান করেন, তবে হয়ত বা এই উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করি। তাই তাঁর নেক নজরের আশায় চাতকের মত অপেক্ষায় রয়েছি। অধীন গুরু দয়াময় দান ব্যতীত ইহা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সাধকদের জন্য এই মায়া কত বড় বিপর্যয় তা যিনি সাধনাতে লিপ্ত হননি তাকে বুঝানো কখনই সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে যদি জগতে পূর্বেই প্রতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা থাকতো তা হলে সবাই কম বেশী একটি ধারণা মানুষের মধ্যে জন্ম নিত। ধীরে ধীরে এই মোহ মায়া বর্জনের বিষয়ে মানুষ উদ্বুদ্ধ হতো। তা থেকে সূফির দিকে বা নিজেকে চেনার তরে মানুষ ফকিরী লাইনে অনেক অগ্রসর হত।

লৌকিক ব্যবস্থা আমাদেরকে এমন ভাবে গ্রাস করে চলেছে যা থেকে একটি মানুষকে উত্তরণ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বোবা বনে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। কারণ সূফিবাদের সংজ্ঞাতে বলে দিয়েছেন গুরু দয়াময় "ইহা একটি বাস্তবতা বর্জিত আজব দেশ"। বাস্তব যে কত প্রকার শৃংখল দিয়ে মুক্তির দিকে অগ্রসর হতে হয় তা যিনি এ রাস্তা বা পথে অবস্থান করেন তিনিই বলতে পারেন বা ধারণা করতে পারেন। তাই একই কথা বার বার পূনরাবৃত্তি করে চলেছি।

সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইল যে, এই সূফিবাদ বা ফকিরী লাইন জীবনের কিছু সময় একটু আয়ত্ত্বে নিয়ে জীবনকে জানবার জন্য চেষ্টা করে দেখলে এ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্ম নিবে। সবার মাঝে যার ফলস্বরূপ জগত সংসার থেকে এই লৌকিকতার কিছু অবসান হতো তা হলে মনের কাছে একটু তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারতাম। জানিনা দয়াময় আল্লাহ পাক সামাজিক এই পরিবেশ গড়ে দেবেন কিনা, এটা তিনিই ভাল বলতে পারেন। তাই সবার জন্য আল্লাহ পাক এর নিকট দোয়া প্রার্থনা রইল তিনি যেন সবাইকে হেদায়েত দান করেন। আমিন!

সবচেয়ে মজার বিষয় হল মানুষ আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। তিনি তাঁর কালাম পাকে ঘোষণা করলেন "মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে।" অর্থাৎ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়া মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। লৌকিক সমাজ সংসারে একজন মানুষ কত টুকু স্বাধীন বিবেকের কড়া নাড়িয়ে একাগ্র মনে একটু ভাবলে বাইরে খুঁজতে হবে না। নিজের কাছেই উত্তরটা পাওয়া যাবে। প্রচলিত শরীয়তের ঝান্ডা কাঁধে উঠায়ে মানুষকে মুক্ত ধারার চিন্তা চেতনা থেকে দূরে সরায়ে উমাইয়া আব্বাসিয়দের চক্রান্তের ইসলামী রূপরেখাকে মানাতে বাধ্য করানো এবং সুফিজম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা চেতনা থেকে মানুষকে দূরে সরানোর কি সব নোংরা খোলসের আবরণে মানুষকে আটকাইয়া রাখা ধর্মের নামে প্রতারণার ব্যবসা চালু রাখার কত যে কৌশল এদের মাথায় খেলা করে চলেছে তা সৃষ্টিকর্তা ভাল জানেন।

যেখানে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালামে ঘোষণা দিলেন "লা ইকরাহা ফিদদ্বীন" "ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই বা জবরদস্তি নাই" এ প্রসঙ্গে রাসুলে পাক তাঁর জীবনাদর্শতে দেখায়ে দিলেন ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়স পর্যন্ত হেরা গুহায় কি কঠিন সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আত্মশুদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা যা উম্মতে মোহাম্মদী যদি নিজেকে আত্মশুদ্ধি করতে চায় তাহলে এই ভাবেই করতে হবে। অথচ এই সময়ের পূর্বে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক বন্দেগীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ এই বিষয়টা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকরি রূপ বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় না। নিজেকে জানার মারফতি জ্ঞান সেখানে পূর্বে হাসিল করার বিধান রাসুলে পাক (সাঃ) (আঃ) দেখিয়েছেন।

এ দিকে ধর্মীয় কর্ণধার ব্যক্তি বর্গ মানুষকে এই শিক্ষা থেকে দূরে সরায়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এরপরও যদি কেহ নিজ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাহা জানার জন্য চেষ্টা করে তবে তার উপর কি প্রকারে অমানুষিক নির্যাতন আর মাছলা মাছায়েলের ফতুয়া দিয়ে তাকে অমানবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়। এই প্রকার সামাজিক শৃংখলের বেরী থেকে মানুষকে মুক্তির ধারাতে নিয়ে আসতে কি করণীয় হতে পারে? এমন প্রশ্নের জবাব হল আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ লৌকিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ সহজ কোন বিষয় না। তারপরও কথা থাকে যে ইসলামের ইতিহাস কি নির্মম পাষণ্ড আর ভয়াবহতার বেরীতে কত না মানুষের প্রাণ আকাতরে কেড়ে নিয়েছে। অথচ কোরান পাকে এই মানুষকে স্বাধীনতার কথা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন। কোরানের বাস্তবায়ন রূপ সমাজ সংসারে না হলে ব্যক্তি জীবনে এর সুফল ফলানো কখনই সম্ভব পর নয়।

তাই, সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান যে, মানুষকে মুক্তির ধারাতে অবস্থান করতে হলে কোরান পাক নির্দেশিত ব্যবস্থার আঙ্গিকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করে যেতে হবে। কোন বাঁধা বিপত্তির হার মানলে বিধান ঠিক রাখা দুরুহ হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ পাক সবাইকে কোরআনের আঙ্গিকে জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন, "আমিন"।

লোক দেখানো ইবাদতবন্দেগী থেকে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এখানেই শেষ নয় বরং কঠিন শাস্তিতে সমাসীন করার অঙ্গীকারাবদ্ধ মহান আল্লাহ পাক। অথচ এই লোক দেখানো বন্দেগী নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারিতে কত যে মানুষের প্রাণহানী ঘটে চলেছে জগত সংসারে। তবুও জ্ঞানী সম্প্রদায় জগত সংসারে এর জন্য দায়ী। কারণ যারা বুঝে না তারা হয়ত ভুল করতে পারে কিন্তু এক শ্রেণীর জ্ঞানীদেরকে দেখা যায় এই ধরনের লৌকিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেও চলেছে।

বিবেক দ্বারা একটি বারও বুঝবার চেষ্টা করে না, জ্ঞানীদের ভুলের কারণে সহজ সরল কাঁচা গলা মোমের মত মানুষগুলো নিজেদের জীবন

দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। মাওলা এদেরকে জ্ঞানপাপীর কবল থেকে কবে রক্ষা করবেন তা তিনিই ভাল বলতে পারেন। এখানেও হয়তবা তকদির নামক বলয়ের শৃংখলাতে আবদ্ধ, এ কারণে হয়তবা এমন পর্যায়ে ঘটে থাকে যা রোধ হয় না। এই তকদির নামক বলয় থেকে বের হয়ে আসার শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ সংসারে প্রচলিত থাকলে হয়তবা এর মধ্য হতে কিছু লোক মনে করলে এই শিক্ষা লাভ করত। এ ধরনের বড় বড় ভুলের পাহাড় সরায়ে কিছুটা আলোর ঝলকানীতে সচল থাকত তা হলে কতই না সুন্দর হত। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তবা এমন দিন আসবে মানুষ সত্য গ্রহণ করার তরে প্রতিযোগিতার ঝড় উঠাবে দলে দলে মানুষ সত্য দীন গ্রহণ করবে। এমন শুভ দিন যেন নিকটেই হয় মহান আল্লাহ পাকের কাছে এই মিনতি। আমিন।

আমরা তরিকার জিন্দেগীতে অন্তত একটি বিষয় সুনিশ্চিত হতে পারি যে, প্রতিটি মানুষকে মুক্তির জন্য একজন মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ বা বায়াত গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সে ঐ ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। এতে যদি ভুল হয় তা হলে এর দায়বদ্ধতা নিজের কাঁধেই থাকবে। সঠিক হলে সে সুপথ গামীর পথ অন্তত সে নির্বাচন করেছে। সুপথ লাভ করতে বেশ কিছু জনম অতিবাহিত হলেও দোষের কিছু থাকে না অথচ এই চরম সত্য সমাজ সংসারের অনেক মানুষই বুঝতে পেরেছে যে, একজন মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এটা বুঝবার পরও এই মানুষটা নির্বাচন করতে পারছে না বা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মুচরা মুচরী শুরু করে দেয়। কারণ আমি আপনি তো তকদির নামক বলয়ে আবদ্ধ একটি গন্ডির মধ্যে ঢাকা পরে আছি। এই বলয় ছিন্ন করে মুক্তির ধারাতে নিজেকে সমর্পণ করা সহজ কোন বিষয় নয়। এর পরেও এর সঙ্গে থাকবে শয়তান বা খান্নাস নাম অপশক্তি। আমারই ভিতরে যার সক্রিয় অবস্থান সে যে কি প্রকারের আকামের গুরু ঠাকুর যারা সাধক বা যোগী এরাই কেবল এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। সর্ব সাধারণ এর বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত বুঝতে পারে না। কারণ শয়তান কেবলই গুরু পূজা বা পীর পূজাকে ভয় পায়। কেননা পীর পূজার মধ্য দিয়েই কেবল এই শয়তানী স্বত্ত্বাকে বশে আনা সম্ভব। অন্য কোন উপায় হয়তবা নেই বা আমার জানা নেই। যদি থাকত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হতে পীর পূজা বা গুরু পূজা বহু পূর্বে বিলুপ্ত ঘটে যেত।

অথচ আল্লাহ পাকের মূল সত্য বিধানটা গুরু বাদী আউলিয়া কেরামগণ জিইয়ে রেখেছেন। এখানে জাহের বাতেন সহ আল্লাহ পাকের অসংখ্য রহস্য লোকের লীলার পরিপূর্ণ রূপ আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তারা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। যা কখনই ধ্বংস হবার নহে। এ যেন চির বিস্ময়কর এক আজব লীলা খেলা। যে বা যিনি এই খেলায় না মেতেছেন তাকে বুঝানো কখনই সম্ভবপর নয়। অথচ যিনি এই খেলাতে অংশ নিয়েছেন জগত সংসার তার উপর বিরূপ আচরনে মাতোয়ারা হয়ে কতো না অমানুষিক নির্যাতনের তরবারী চালিয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে? আল্লাহ পাকের এই খেলা সম্বন্ধে যারা জানতে পেরেছে তারা অকপটে প্রকাশ করে তারা সমাজ সংসার হতে কাফের নামের এক চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করে চলেছে। কাউকে আবার জীবনটাও দিতে হয়েছে। যেমন আল্লামা ইকবাল, মনসুর হাল্লাজ এমন দর্শনের ব্যক্তি বর্গ আরও হয়তবা অনেক আছেন যাদের কথা উল্লেখ করলাম না। উনাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যদি কেহ সত্যের উপর সু-প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে তাদেরকে এই রকম কঠিন আঘাত সহ্য করে হলেও সত্যকে জিইয়ে রাখতে হবে।

কেননা পাক-পাঞ্জাতন থেকে শুরু করে যত প্রকার অলি আউলিয়া গাউস-কুতুব, আবদাল-আরিফগণ দুনিয়ার বুকে সত্যের অমিয় সুধা পান করে চলেছেন এবং মানুষের মাঝে বিলিয়েছেন তাদের বেশীর ভাগ বা দু-একজন ব্যতীত সবাই সমাজ-সংসারের নির্যাতনের তরবারীতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। বিধির কি নির্মম বিধান তা তিনিই ভাল জানেন। সূফিদর্শনের উপর গবেষণার যে বিস্ময়কর দর্শন উপস্থাপন করেছেন দাদা জান শাহ সূফি সদর উদ্দীন আহম্মদ চিশতী তা হল, প্রতিটি মানুষ জগত সংসারে শিশু থেকে শুরু করে ১৮ বছরে সে পূর্ণ কাফেরে পদার্পণ করে। যদি সে এই কাফের থেকে উত্তরণ হতে নিজেকে বাহির করতে না পারে তা হলে সে ঐ কাফের উপাধিতে সমাসীন থাকে।

তাই আধ্যাত্মিক দর্শনের দৃষ্টান্তে অবশ্যই একজন মানুষকে কাফের থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই গুরু বাদীতে আত্মসমর্পণ করে কঠিন সাধনা পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেকে মুসলমান বা আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীলদের দলে নিজেকে সমাসীন করতে হবে। এ মত ও পথ ব্যতীত

অন্য কোন পথ আধ্যাত্মিক দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই রুপকথার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক মনিষীগণ বলে থাকেন এই পথে আসাটাও তকদির এর লিখন থাকতে হবে নচেৎ ইহা সম্ভবপর নয় বলে মন্তব্য করে গেছেন। নিজের ভিতরে নিজের আমিত্বকে লোপ বা বিলুপ্ত ঘটায়ে নিজেকে জানতে ও চিনিতে পারা যায়। এই নিজেকে কেন চিনব আর এই চেনার প্রয়োজন কেন? জবাবে যদি বলি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তুমি তোমার বক্ষাকে তোমার মাঝেই দেখতে পাবে। আবার যদি বলি মহানবী বলেছেন– "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থ যিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন সে স্বয়ং আল্লাহকে চিনেছে।

এই সকল মনিষীগণ এর বাণী একই সীমা রেখাতে অবস্থান করে চলেছে যা আধ্যাত্মিক দর্শনে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এই দর্শনের কোন মিল তো নেই আবার এক এর সঙ্গে অপরের লেলিয়ে দিয়ে সমাজের বুকে মানুষে মানুষে হানাহানিতে, ঘৃণা আর কুসংস্কার এর মাঝে মানুষকে আবদ্ধ রেখেছে। তার পরেও যদি কোন ব্যক্তি এই শৃংখলার বেরী থেকে বেরিয়ে আসতে চায় জগত সংসার তার উপর কি এক অমানবিক আচরণে তাকে বেঁধে রাখার প্রয়াশ পরিচালনা করে যেন সে কত না অপরাধী। সত্যের দিকে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন আচরণ তাকে জানান দেয় যে সে শত প্রবঞ্চনা উপেক্ষা করেও সত্যকে আঁকড়ে ধরে।

আর যিনি তা করতে সক্ষম হন তিনিই আধ্যাত্মিক দর্শনে নিজের নামটা লিপিবদ্ধ করান। আর যিনি এই সমাজ সংস্কারের প্রবঞ্চনার কাছে নতি স্বীকার করেন তার পক্ষে এই সত্য সাগরে অবগাহন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ যে মহান সৃষ্টিকর্তার এক বিস্ময়কর এক লীলা খেলা আর কঠিন শৃংখল এ আবদ্ধ জীবনে নিজেকে আবদ্ধ করায়ে সেই শৃংখল থেকে মুক্ত হবার এক অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বই খাতা কলম সবই অকেজ। যিনি এই পথে না এসেছেন তার পক্ষে এই শিক্ষা বুঝা খুবই কঠিন।

যেহেতু লেখনী সার্বজনীন সে কারণে মহৎগণ বলে থাকেন তকদিরের লিখন যদি ও এটা কে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই তকদির নামক বলয় থেকেও বের হয়ে আসতে হবে নিজেকে মুক্তির ধারাতে অবস্থান করতে হলে, এই মুসলমান হওয়া বা কাফের থেকে মুক্তি লাভ করার বিষয়ে যদি বলতে চাই তাহলে মহানবীর সেই অমিয় বাণীটি অবলোকন করি। তাহলো প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন করে শয়তান আছে এই বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ তাহলে আপনার? জবাবে মহানবী বললেন আমার সঙ্গে ও একজন শয়তান ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি। তাই সুফি দর্শনে এই শয়তান হতে মুক্তি নিতে হবে নচেৎ শয়তানকে মুসলমান বানাইয়া ফেলতে হবে। এই শয়তানের কু আশ্রিত থেকে নিজেকে মুক্তির শিক্ষা সূফি সাধকগণ তাদের অনুসারীদেরকে কালে কালে যুগে যুগে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। এ যেন অনন্ত কালের অবিচল একই ধারা একই নীতি একই তালিম তালকীনে অবস্থান করে চলেছে। যার নীতি ও আদর্শের কোন পরিবর্তন খুঁজে পেলাম না।

সৃষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত এই একই নীতি থাকবে বলে মনে হয়। কারণ সৃষ্টিতে আল্লাহ পাক এই একই উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষকে তৈরী করেছেন। অথচ প্রচলিত সমাজ সংসার আমাদের কি বিশ্রী আর নোংরামী শিক্ষা দিয়ে চলেছে এটা উল্লেখ করে পাঠককে কষ্ট দিতে চাই না। তাই সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইল এই শয়তান কে মুসলমান বানিয়ে ফেলুন বা শয়তান হতে মুক্তি অর্জন করুন।

যদি একটি মানব শিশু তার শিশুকাল থেকে নিজেকে মুক্তির শিক্ষাটা পেত যেমন মোহাম্মদ এর আদর্শ বা তাঁর শিশু কালেরই বিকাশ তাহলে মানুষের জন্য সঠিক আদর্শের কি সুন্দর পটভূমি সে রচনা করে যেতে পারত। তার শৈশব এর পালনীয় বিষয়াদি আমাদের আদর্শ বা বাস্তব জীবনে এ বিধি বিধান সমাজ সংসারে চালু থাকত তাহলে কি মানুষ মানুষের সঙ্গে অমানবিক যে সকল আচরণ করে চলেছে তার অপমৃত্যু ঘটত। তার যৌবন কালের করণীয় বিষয় যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চালু থাকত তাহলে মানুষ আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠত মানুষে মানুষে সাম্যের একটি দৃষ্টান্ত গড়ে উঠত।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাম্যের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করত। মানুষের অমানুষিক আচরণ আদর্শের কাছে মাথা নুইয়ে আছরে পরতো। থাকত না কোন প্রকার ধোঁকা, মানুষ গড়ে উঠত প্রকৃত আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত। মানুষ জনমের সার্থকতা খুঁজে পেত, অন্যায় সমাজ সংসার থেকে বিদায় নিত। অথচ কি বিধি বিধান সমাজ সংসারে সু-প্রতিষ্ঠিত রইল ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ খুন করতে তার হৃদয় কাঁপে না, মানুষে মানুষে ধর্ম আর ফেকরা বাজির ঢোল পিটিয়ে কত মানুষ ধর্মটা বুঝবার পূর্বেই জীবন দিয়ে চলেছে এদের অবস্থার কোন পরিণতি তা হয়তো আল্লাহ মাবুদ ভাল জানেন। আর এদের কে যারা উৎসাহিত করে চলেছে তাদের পরিণতিও আল্লাহর কাছেই। কারণ ধর্মীয় অনুভূতির লেখনী জানা থাকলেও স্থান কাল পাত্র ভেদেই প্রকাশ এ আর এক যন্ত্রণার সাগর বয়ে বেড়ানো। কবে সেই শুভ দিনের সূর্য উদিত হবে যেখানে থাকবে না মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রেষারেষী মানুষ সবাই নিজের মুক্তির পথের শিক্ষা নিয়ে দ্রুত আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সফলতার প্রান্তে পৌঁছাইয়া যাইবে।

মানুষ আল্লাহর নৈকট্যশীলদের দলে পৌঁছাইয়া যাইবে। মানুষ আল্লাহর গুণাবলীতে মিশে যাইবে, থাকবেনা কোন রেষারেষি বিভেদ আর বিশৃংখলা বিলুপ্তি হবে। মানুষ মানুষের কল্যাণে নিজেকে সোপর্দ করবে শান্তির সূর্য উদিত হবে। মানুষ পাবে মুক্তি। এই শুভ দিনের কবে সূচনা হবে তবুও প্রত্যাশা রইল মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এই শুভ দিনের ভাবনা যেন মানুষ করে এবং জ্ঞানীগণ এই বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য নিজেদেরকে সেই উপযুক্ততায় গঠন করে বা সচেষ্ট থাকে। যেহেতু হেদায়েতের মালিক আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন। তাই তাঁহার কাছেই এই প্রার্থনা বা মিনতি এই ব্যবস্থা পত্র পৃথিবীর বুকে অচিরেই দান করেন। আমিন। আমিন। আমিন।

কোরআনুল মাজিদ সূরা আম্বিয়াতে দেখতে পাই ৩৫নং আয়াত “প্রত্যেক নফস্ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমরা পরীক্ষা করি ভাল এবং মন্দ দ্বারা এবং আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে” এই কালাম পাকে উল্লেখিত রয়েছে নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। অথচ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যাহা দেখতে পাই আর তা হল মানুষ মারা যায় এবং এই মানুষের রুহের মাগফিরাত চাওয়া হয়। এ রকম ভুলের সাগরে সামাজিক ধর্মীয়

বিধান সু-প্রতিষ্ঠিত রূপে মানুষ ভুলটা সত্য রূপে গ্রহণ করে আছে। অথচ সত্যটা যদি কেহ জানান দিতে চায় তাহলে সেটা গ্রহণ তো দূরের কথা তার উপর এই সমাজ ব্যবস্থা কি নির্যাতন চালায় তা দেখতে বা বুঝতে হলে আপনাকে এ রকম প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা মূলক বিধান জারী করলেই বুঝতে পারবেন।

কারণ হিসাবে বলা যায় রুহ মৃত্যুবরণ করে না। ইনসান অর্থ মানুষ, নাস অর্থ মানুষ, নফস অর্থ মানুষ এই তিন প্রকার বাক্যের ভিন্নতা সম্পর্কে সঠিক বিষয়টা বুঝতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শুধু শুধু ব্যবহার করেন নাই। ইহা গভীর তাৎপর্য বহন করে। যারা ইসলামের আধ্যাত্মিক গবেষণা করে চলেছেন তারাই ভাল বলতে পারেন। যেহেতু কোরআনুল মাজিদের ঐশী বাণী তাই ইহা জ্ঞানীদের ভাববার জন্য উল্লেখ করলাম। লৌকিকতার অবগাহনে এই ইসলামের উপর কত না ভুলের পাহাড় জমা হয়ে আছে ইহা কি মুখের কথাতে পরিস্কার হয়ে যাবে? কখনই না। এ বিষয়ে সঠিক চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্গের সু-নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্য দিয়ে একদিন হয়তবা পৃথিবীর বুকে কোরআনের এই অমিয় বাণীর সার্থক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আত্মপ্রকাশ করবে।

সব চাইতে যে বিষয়টা মানুষের মধ্যে বিরাজ করে চলেছে সেটা হল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহকে দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু কোন অবস্থাতে আল্লাহ পাক দোষের মধ্যে থাকতে পারে না। কোরআন গুণবাচকে সমাসীন আর, এই গুণকে বা গুণের অধিকারী হওয়ার তরে মানুষকে আদেশ আর উপদেশ এ ভরপুর রেখেছে কোরআন। যেমন কোন মানুষ অপরিণত বয়সে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলে মানুষ আক্ষেপের দৃষ্টিতে বলে আল্লাহ কেড়ে নিয়েছে। এক বারও এই মানুষ ভাবে না আমার দোষটা কোথায়। এক বাক্যে আল্লাহকে দোষারোপ করে।

ব্যবসা বাণিজ্যে অবনতি হলে আল্লাহকে দোষারোপ করে। আবার কঠিন কোন রোগ বালাই ঘটে গেলে আল্লাহকে দোষারোপ করে। দলিল হিসাবে দাঁড় করায় আল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। এই রকম যুক্তি পেশ করেন। অথচ মহান আল্লাহ পাক এই সৃষ্টির শুরুতে যে

দর্শন আমরা দেখতে পাই আর তা হল বিখ্যাত অলি বাবা সামসেত্ত্বাবরিজ তাঁর দর্শনে ফুটায়ে তুলছেন আদম গন্ধম খাবে এটা আল্লাহর নিষেধ ছিল ইবলিস সেজদা দিবে, না দেওয়াতে শয়তান হিসাবে পরিগণিত হল এটা আদমের মধ্যে নূরে মোহাম্মাদী মওজুদ তাই তিনি মোরাকাবাতে দেখতে পেলেন আল্লাহ চায় কিন্তু দোষ নিবে না। কারণ এটা না হলে আল্লাহর দুনিয়া নামক সৃষ্টি হবে না।

আজাজিল মোরাকাবাতে দেখতে পেলেন আমি সেজদা দিলে দুনিয়া নামের ষ্টেশন হয় না। কিন্তু আল্লাহ দোষ নিবে না। এ জন্য বাবা সামসেত্ত্বাবরিজ বর্ণনা করেছেন। আজাজিল কে আলাইহেস সালাতুস সালাম বর্ণনা করার কথা। এ যেন "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, প্রাণ দিয়ে সঁপেছি এই মন প্রাণ" আপন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাকে পূরণের প্রেম সবার মাঝে বুঝবার ক্ষমতা কয়জনের ভাগ্যে জোটে। এবার বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো আর এই দর্শন প্রচারিত সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণনা করা কত টুকো যুক্তি যুক্ত তা আমার জানা নাই।

সত্য দর্শনে যদি কোন সাধক তার ভাব জগতে প্রাপ্ত বিষয় Negative দর্শন ফুটে উঠে ইহা সাধারণের আশ্রয়ে সমাধান টানতে চায় তা হলে তা কেহই বিশ্বাস করবে না। জগত সংসারের মায়ার বন্ধনে মানুষ এতটা অ-মানুষে পর্দাপণ করে চলেছে যা মন্দ আধারে তার বিবেককে ঢেকে ফেলে। একটি মানুষকে তার দৈহিক নির্যাতনের চাইতে তাকে মানসিক ভাবে আঘাতে প্রতি নিয়ত কি প্রকার যন্ত্রণার পাহাড় চাপিয়ে চলেছে যা অবগত হবার পরও এ বিষয়ে কোন সুরাহার পথ পেলাম না। তাই সৃষ্টিকর্তার নিকট ছেড়ে দিলাম যা কল্যাণকর তা যেন হয়। পূর্বের অনুভূতি আবার সক্রিয় হয়ে উঠে চলেছে। পূর্বের পদক্ষেপ গুলো সুফি দর্শনে গ্রহণ না করায় ঐ পদক্ষেপ জাগতিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে একটি ফায়সালা পাই। এ কারণে উহা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কিছু আকার ইঙ্গিত আভাস সহ ঘটনা বহুল একটি কালো থাবা আমার সমানে অবস্থান করে চলেছে। এটাকে সামনে নিয়েই চলেছি। যদিও এ বিষয়টা লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করানোটা দোষণীয়, যদি অতিরিক্ত কিছু ঘটে যায় তবে জ্ঞানীদের জন্য ইশারা রাখলাম।

যাই হোক আমার মোর্শেদ কেবলা বার বার যে কথাটা বলে থাকেন তা হল– কাবায় শরিয়ত আর হেরা গুহায় মারেফত এই হেরা গুহার দর্শন সম্পর্কে সবাই বুঝতে পারে না। এই জন্য উল্টা পাল্টা মন্তব্য করে থাকে কিন্তু তারা না বুঝতে পারে, না জানতে পারে, মোহ দ্বারা আবিষ্ট থাকে, এই জন্য এদের দোষারোপ বা গালি দেবার বিধান নাই। এ জন্য এদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে উপদেশ রইল"।

লৌকিকতা আর সন্দেহ আমাকে যেমন রাহুগ্রাস করে চলেছে, তেমনি মনে হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাস এ রকম কালো অধ্যায় রচনা করে চলেছে জালিমগণ, এ জন্য ব্যথিত হবার কিছু নেই। যাহারা বিদ্রূপ আর মুনাফেকীতে লিপ্ত তাহারাই বিচারক তাহারাই সমাজ সংসারের জ্ঞানী। এদের কালো থাবাতে যিনি একবার পড়েছে তিনিই বলতে পারবেন এদের দ্বারা যুগে যুগে সত্য পথের যাত্রীরা জীবন দিয়ে চলেছে। আমার মুর্শিদ বলেছিলেন কাফের না থাকলে আল্লাহর পরীক্ষা থাকে না। বার বার একটি প্রশ্ন জাগে কাফের দ্বারা আল্লাহ সত্য পথের যাত্রীদেরকে আঘাত করে। এটাই কি আল্লাহর বিধান। ইতিহাসের দিকে তাকালে এই দর্শন বার বার ফুটে উঠে। যদিও এই কথাগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই, তবুও জ্ঞানীর ইশারা বা নিদর্শন স্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলাম।

সত্য কি এতই নির্মম আর যন্ত্রণার কারণ বাবা জাহাঙ্গীর বার বার তার লিখনীতে উল্লেখ করেছেন কাউকে গালি দিতে নেই কারণ তকদির এর বলয়ে ইহা সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আবদ্ধ। তাছাড়া হয়তবা একটি মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে পরিগণিত হওয়ার জন্য যে খান্নাস নামক শয়তানের যে ধোকা ইহা পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি সফলতা লাভ করতে পারে তবেই সে সু-সংবাদ প্রাপ্ত মানব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর ব্যর্থ হলে বিফল অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক আগ্নেয়গিরির পথ অবলম্বন করে চলেছে। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে সত্যকে জাগ্রত রাখতে জীবনটা উৎসর্গ করতে অ-সম্মতি বা অ-পারগতার ছাপই যেন ব্যর্থতা, তাই এই দেহটাকে সর্ব প্রকার যাতনার বোঝা বহন করার মত প্রস্তুতি সদা সর্বদা রেখে জীবন পরিচালনা করা উচিত। ১১-৪০ জীবনের

কঠিন সময় অতিবাহিত করে চলেছি। জানি না দয়াল গুরু এই যন্ত্রণা কত সময় কাল এই নফসের উপর বহন করাইবেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, এই কল বুকে নিয়ে জীবনটাকে সাজাইতে চেয়েছি, এটাই আমার অপরাধ।

তবুও শান্তির মূল লক্ষ্য হল ধর্মের মূল বিষয় অনুসন্ধান করা। তবে কেন জানি আজ বার বার মনে হয়েছে আধ্যাত্মিক দর্শনে যারা বিচরণ করে চলে, জাগতিক তাদেরকে বিরোধের ছকে আটকাতে চায় কিন্তু এমন একটা সময় এই সুযোগটা সুযোগ সন্ধানিরা গ্রহণ করেছে, আধ্যাত্মিক জগতে যদি কেহ শট খায় তাহলে বুঝতে পারবে। নচেৎ নহে, উল্লেখ করতে পারলাম না তকদির নামক বলয় আমাকে কি করে রেখেছে। তবে আমার একার কারণে যদি অনেকের সুখ বিঘ্নিত হয় তবে তাদের সুখের মূল্যায়ন যেন তারা জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করে। একদিন হয়তবা বুঝবে যদি তকদিরে থাকে এটাই প্রত্যাশা।

পৃথিবীতে সত্য পথের যাত্রীদের সমস্যা থাকে কিন্তু আমার বেলায় এমন ঘটবে জানি না। মাওলার কি খেলা, তবে যারা এই মিথ্যাচার এবং চক্রান্তের এই সিঁড়ি তৈরি করেছে এদের জ্ঞান কে মূল্যায়ন করে চলেছি। জগতে যারা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকে এরাই সমাজের বিবেক তাই উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে এগুলো নিজেই বহন করে চলেছি। কোন দিন হয়তবা জ্ঞানীরা এ বিষয়ের মোড়ক উন্মোচন করে দিতে পারবে এদের জন্য ইশারা রেখে গেলাম।

সত্য কথা বলার সময় যদি না পাই তাই লিখলাম ফেব্রুয়ারীতে পালায়ন করি। রাতে বসে আছি, বাহিরে কিছু লোক গভীর রাতে বাড়ীতে আসে এবং তারা বলা বলি করতে থাকে ঘরের বেড়া কেটে বাহির করে মেরে দোগাছী বাজারে ফেলে দিয়ে কেস করা যাবে। তখন সাধনার স্কুল থেকে শট খেয়ে বাড়ীতে এসেছি এমন অবস্থায় প্রতিবাদ করার সাহস না পেয়ে পালায়ন করি। কিন্তু সেখানেও আমাকে ছাড়া হয়নি। আজও পর্যন্ত এ লোক গুলোকে প্রমাণ সহ ধরতে পারি নাই। তাই এই ব্যর্থতা আর কষ্ট বুকে

নিয়ে ঘুরছি। এ ছাড়া প্রতি নিয়ত মানুষের মিথ্যাচার, কিন্তু এর হোতা ধরা ছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করে চলেছে। এই বিষয় কিভাবে প্রকাশ করব। আল্লাহ পাক ভাল জানেন। বিবেকবান ব্যক্তি বর্গ ভেবে দেখবেন।

নির্যাতন এর বর্ণনা

মানুষ প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত যদি কোন বা কোন প্রকার চালাকি নিয়ে দৌঁড়ায় একটি মানুষকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু মূলে অবস্থান করে অন্য হিসাব মিথ্যাচার দ্বারা প্রতিনিয়ত এক কঠিন যাতনা সয়ে চলেছি। মূল মানবরূপে দানব এর চরিত্র এখানে উল্লেখ না করাই শ্রেয় মনে করলাম শুধু তাই নয় জগত সংসারে এসে সূফির দর্শনে ধাবিত হওয়াটা আমার জীবনে এতো বিপর্যয় গ্রহণ করিতে হইবে এটা ভাবিনি। তবুও শয়তানী শক্তির সাথে আপোষ না করাই ভাল বলে মনে করিলাম। কারণ জগত সংসার বিচার কাঠগড়া সবই চায় প্রমাণ আর সাক্ষ্য কিন্তু এই সাক্ষ্য আর প্রমাণকে আড়ালে রেখে তারা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যদি দয়াময় মাবুদ কখনও সময় দেন তা হলে আপন আপন কর্মের ফল একদিন যেন আল্লাহ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়।

আপন অনুভূতি

জীবন পথের গতি-জাগতিক ধারায় অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করায় সর্ব সময় যেটা পাওয়া গেল তা হল চক্রান্তের ফাঁদগুলো এতো জটিল করে তোলা হচ্ছে যে জীবন নামের যন্ত্রণা কত সময় বা আর কতকাল এভাবে বয়ে বেড়াতে হবে এটা এক দুর্বিসহ আধার তৈরি করে চলেছে। বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন এ বিষয়টা মাথায় রেখে চলেছি। কিন্তু কার ভাবনা ভেবে শয়তানি শক্তি পর্যায়ক্রমে এক কাতারে সমাবেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পতাকা তলে আমাকেও দাঁড়াতে বাধ্য করার প্রয়াস সর্বদা অভিনয় আর একটি মানুষকে ফাঁদে ফেলানোর অবিরাম কৌশল পালন করে

চলেছে। বুঝতে পারলেও নিজের বা একান্তজনদেরকেই বুঝানো সম্ভব হল না। তাই একান্তভাবে মাবুদের নিকট প্রার্থনা করে গেলাম নিজের নিকট আত্মীয়রা যা করছে মাবুদ যেন এ বিচার করেন। এখানে দুইটা পথ উল্লেখ করলাম (i) হয় হেদায়েত করবেন (ii) নতুবা শাস্তিতে সমাসীন করবেন। আর আমার এই অনুভূতি যুক্তির নিরিখে নয় ধর্মীয় দর্শনের পটভূমিতে যেন জ্ঞানীগণ ভেবে দেখেন। আর যারা মূল বিষয় সম্পর্কে অজানা কিন্তু অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এক কাতারে সামিল হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারেনি আল্লাহ পাক যেন তাদের মাফ করে দেন। সর্বশেষে এই ঘটনার বাইরে সকল মানুষের মুক্তির জন্য মাবুদের কাছে প্রার্থনা রইল সকল মানুষ মুক্তি পাক। সকল মানুষ শান্তিতে থাক। সবাইকে যেন হেদায়েত দান করেন। আমার যত প্রকার যন্ত্রণা আছে সব সহ্য করার ক্ষমতা আমাকে প্রেরণ করেন।

ধর্ম

ধর্মের সংজ্ঞা লিখতে বুঝি মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যে বিধান বা নিয়ম তিনি আরোপ করেছেন তাহা পূর্ণভাবে মানিয়া জীবনকে পরিচালনা করার পর সম্পাদন তব্য করা। গোত্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও (পাপ বা মন্দ) (নেক বা পূর্ণ) বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি এবং পরলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার আচরণ উপসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলী। এরপরও সৎকর্ম, পূণ্যকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম। স্বভাব প্রকৃতি প্রত্যেক জীব বা বস্তুর নিজস্ব গুণ পূর্ণ বা ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পূণ্যের বিচারকর্তা, পালনকর্তা সহ বিশ্ব বিধাতা কর্তৃক মানুষ মানুষত্বের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান আইন রীতি, সাধনার পথ, ও সতীত্ব ও রাশিচক্রের লগ্ন থেকে প্রাপ্ত স্থানসহ যাবতীয় কর্ম-কান্ড পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করন। পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার জন্য এতটুকো উল্লেখ করিলাম। এবার সৃষ্টিতে যে বিধানে সমাসীন তার নাম ইসলাম আরবিতে দ্বীন অর্থ ধর্ম-ইয়াম

অর্থ কাল বা সময় এই কাল বা সময় মহান সৃষ্টি কর্তার একটি রহস্যময়লীলা যা সৃষ্টিতে সমাসীন হয়ে পূর্ণভাবে সম্পাদন করা। এখন প্রশ্ন জাগে ইসলাম ধর্ম কি নির্দেশ করেছে। এর জবাব "কোরান" ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইংরেজীতে বলে Code of life কোরানকে পূর্ণভাবে অবলম্বন করে জীবনকে গড়তে পারলে ইসলামের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। এটাকি সহজ কোন বিষয় তাই এর সুবিন্যস্তভাবে ভাবকে অলংকৃত করে যে মহা মানবটি আদর্শ স্থাপন করেছে তিনি নবী যার নিকট অহি মারফত এই কিতাব নাজেল হয়। তাঁর জীবন শুরু থেকে পরদা গ্রহণ পর্যন্ত সময় বা কালকে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে নবুয়্যতী লাভ পর্যন্ত "৪০" চল্লিশ বছর বয়স তিনি কি নিয়ম নীতিতে জীবনকে গড়েছেন যা দ্বারা তিনি নবুয়্যতী লাভ করতে পারেন। বিশ্ব বিধাতার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন বা এই লাভ করার আদর্শ স্থাপন করে গোটা দুনিয়াকে বুঝায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কার্যত এই নীতি বা ধারা সৃষ্টি রাজ্যে জ্ঞান লাভের পর থেকে ধর্মকে অনুসন্ধান করে এই পথ বা মতের কোন মিল বা সংগতি ধর্মীয় আচরণ বা শিক্ষা নীতিতে পূর্ণতার প্রতিফলন চোখে পরে না যা পরে তা হল রূপান্তর বাদ বা কিছু অংশ বিশেষ পালনীয় এবং ভিন্ন মত সংযোজিত হয়ে ধর্মের বড়াইকে বাড়িয়ে এমন এক জটিল আকার ধারণ করে মানব সভ্যতাকে ধর্ম থেকে বিতাড়িত করার বা মূল ধারা থেকে দূরে সরায়ে ব্যক্তি মতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে ধর্মের যে দৃষ্টান্ত সাজানো হয়েছে তা অবলম্বন করে এক জন মানব-মানবী কিভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করবে তা প্রশ্ন বিদ্ধ করে।

এজন্য মূল দর্শনের কিছুটা আকার বা ইঙ্গিত দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে মত প্রকাশ করি। রাসূল (সাঃ) (আঃ) প্রচারিত ধর্মীয় নীতি কি তার বর্ণনা: রাসূল প্রচারিত ধর্ম ছিল ২ (দুই)টি মূল বিষয় (১) মূলনীতি এটাকে আরবিতে অসুলে দ্বীন অন্য ভাষায় বলে Fundamantal অর্থ এর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না হয় অথবা ইহা অবশ্যই পালনতব্য করতে সম্মত হলে "রসুলের ধর্মের বিধানকে মেনে নেওয়া বুঝায়

(১) তৌহিদ অর্থ অ দ্বৈত-বাদ বা একত্ববাদ।

(২) আদল অর্থ আল্লাহ সূক্ষ ন্যায় বিচারক।

(৩) নবুয়্যত – অর্থ আল্লাহ হতে অহি প্রাপ্ত একজন হেদায়েত দানকারী ব্যক্তি।

(৪) ইমামত– অর্থ খোদাই শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ মনোনীত যোগ্য নেতৃত্ব।

(৫) আখেরাত–অর্থ পারত্রিক মুক্তি প্রাপ্ত অবস্থা অর্থাৎ এক কথায় জান্নাতের বিশ্বাস।

এই উল্লেখিত পাঁচটি মূল নীতি কোন প্রকার গাফেল না হয় এ জন্য মন, দেহ, জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ মান্যতার স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করতে হয়। এক কথায় পূর্ন মেনে নেওয়া।

(ii) আমল নীতি আরবিতে কারা বা ফ্রয়েদ্বীন অন্য ভাষায় Institutional অর্থ আয়ত্ত করা বা পালন করে ফল লাভ করার জন্য নির্দেশনার আমল বলা যেতে পারে।

(১) সালাত – অর্থ নামাজ (মেজাজী -হাকিকী)

(২) সিয়াম – অর্থ রোজা (মেজাজী-হাকিকী)

(৩) জাকাত – অর্থ সম্পদের কর বা আমিত্বের উৎসর্গ

(৪) হজ্ব – অর্থ বাৎসরিক আনুষ্ঠানিক ব্রতী বা দিল কাবার হজ্জ)

(৫) খূমস–অর্থ নির্ধারিত আয় থেকে প্রতি দিনের কর প্রদান শতকরা ৫ পাঁচ ভাগ)

(৬) জেহাদ – অর্থ ধর্মের জন্য যুদ্ধ

বিষয়গুলো সদরউদ্দিন আহম্মদ চিশত্বীর লেখা হতে অবগত।

১১ এগারটি বিষয় বা নীতিতে ধর্মের দীক্ষা রাসূল দিয়েছেন অথচ বাস্ত বতা কি?

৫টি স্তম্ভ (১) কলেমা (২) নামাজ (৩) রোজা (৪) হজ্ব (৫) যাকাত গরীব এর জন্য হজ্ব ও জাকাত বাদ এভাবে রুপান্তর বাদ থেকে কালক্রমে ধীরে ধীরে ধর্মের ফেকরা এত বেশি দাঁড়িয়েছে যে বর্তমান শত ছাড়িয়ে যাবে ইসলামের ফেকরা বা দল।

তাই মূল ধারার ধর্মীয় বিধান পেতে কি করণীয় জ্ঞানীদের ভাবধারা জন্য এই লিখনী টুকো দাঁড় করিয়ে বিবেকের জিজ্ঞাসায় প্রশ্ন রাখা হলো।

অথচ সূরা ইয়াসীন (২১) আয়াত– "আত্ তাবিউ আনলা ইয়াস আলুকুম আজরান ওয়াহুম মুহ্ তাদুন"

অর্থ–তোমরা অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছে মজুরী চায় না এবং তাহারা হেদায়েত পাইয়াছে।

উক্ত আয়াত দ্বারা কোরান কত সুন্দর ভাবে জানিয়ে দিল যেন বুঝতে কষ্ট না হয়। অথচ আজকের আলেম নামের জ্ঞানীদের শিক্ষা নীতির ধর্মীয় যে কলা কৌশল এই আয়াতের মান্য তা প্রশ্ন বিদ্ধ করে। এই ভাবধারার সমাধান টুকো কোথায়। কে এই সদোত্তরগুলো মানব-মানবীকে জানাবে? কোরান সম্পর্কে ভিন্ন একটু ভাবনা রাখতে চাই তা হল। রসূল (সাঃ) (আঃ) ওফাত বা পরদা গ্রহণের পর এই কোরান সংকলিত হয় যা বর্তমান সাজানো অবয়বগুলোর ভিন্নতা চোখে পড়ে। এর কোন সদোত্তর না পেয়ে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিটুকো জানানোর প্রয়াস রাখি। দুনিয়ার জ্ঞানীগুণি হয়তো একদিন এর সদোত্তর দেবে।

প্রথমেই বলতে চাই কোরান পাক এর ২ (দ্বিতীয়) সূরা বাকারা এর অর্থ গাভী—

আয়াত (১) আলিফ, লাম, মীম

(২) যা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদাললিল মুত্তাকী।

(১) মুত্তাক্কায়াতের আয়াত (২) শাশ্বত কিতাব (৩) হেদায়েত দানে মুত্তাকী।

অন্যান্য বিষয় : বৌ তালাক এর আয়াতগুলো পঠিতব্য কালাম পাকের যে বর্ণনার মধ্যে স্থান করে আছে তা সাজানোকৃত সুরাটিতে মূল বক্তব্যের ধারাকে অমিলের ধারাতে অনুসরণ করে। জ্ঞানীদের কাছে এই বিষয়টা ভেবে সিদ্ধান্ত জানানোর আবেদন রইল। গবেষণার নিরীখে বিষয়টা জ্ঞাত করে সবার জন্য প্রকাশ করলাম। ভ্রান্তি থাকলে হয়তবা একদিন জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ধরা পরবে। এরপরও ছোট নামাজ শিক্ষার বইসহ বিভিন্ন আলেমগণ কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ বলেন কিন্তু বর্ণনাকৃত আয়াত ৬২৩৬ বাকী আয়াতগুলো বিষয় কি ছিল বা নাই বা প্রথম গণনা ঠিক নয় এত ভিন্নতা এর সঠিক জবাবগুলো কার কাছে মিলবে?

(৫) সূরা মায়েদা–আয়াত ৪

সূরা মায়েদা আয়াত ৬৭

(৬৭) ইয়া আইউহার রাসূল বাল্লেগ মা উনজিলা ইলাইকামির রাব্বেকা আন্তা আলীউন মাওলাল মোমেনীন অ ইনলাম তাফআল ফালা বাল লাগতা রেসালাহাতাহু আল্লাহু ইয়া সেমুফা মিনান নাস।

অর্থ–হে রসূল (সাঃ) (আঃ) আপনার রব হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহা পৌঁছাইয়া দিন। আর যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার (আল্লাহর) রেসালাত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল না। আল্লাহ আপনাকে মানব মণ্ডলী হইতে লইয়া আসিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের দলকে হেদায়েত করেন না।

(৪) আল ইয়াওমা ইয়া এশা আল্‌লাজিনা কাফারু মিন দ্বীনাকুম ফালা তামসশাওহুম অখশাওনী আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম অ আতমামতু আলাইকুম নেয়ামাতী ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা

অর্থ– আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে আর ভয় করিওনা, ভয় কর আমাকে আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের উপর আমি রাজি হইলাম।

উক্ত আয়াত দুইটি কোরানপাকের সর্বশেষ নাজেলকৃত আয়াত যা গাদীরে খুম এর বর্ণনায় শাহসূফি সদর উদ্দিন চিশতী প্রকাশ করেছেন।

এভাবে কোরান পাক নিয়ে গবেষণা যে সকল জ্ঞানী গণ করে থাকেন। তাদের কাছে সমাধান টুকো জানতে পারলে মানব-মানবীগণ হয়ত ভ্রান্তি গুলো সংবরণ করে সত্য সুন্দর ধর্মীয় জাগরণ ভাবধারাতে কোরান পাকের আলোকে জীবন গড়তে কোন প্রকার সমস্যা ধর্মীয় অনুভূতিতে বাঁধাগ্রস্থ না হয়। তারই পূর্ণাঙ্গ বিধানটুকো যদি কেহ সাজিয়ে দেন তাহলে হয়তো একদিন এই ইসলাম বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণতা লাভে মানব-মানবী সচেষ্ট হবে। কোরানুল মাজিদ এমন এক কিতাব যা দ্বারা ধর্মের পূর্ণতাকে সঠিক নিয়মে পালনতব্য করার যে পদ্ধতিগত অবয়ব দাঁড় করিয়েছে তাহা সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অবনত মস্তিষ্কে মেনে নিতে বাধ্য করে ইহা এমনই শ্বাশত বা চিরন্তন কিতাব বলে সকলের কাছে গৃহিত হয়েছে। তাই

এর বাইরে বলব না এরই আলোকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক যে জগত সমূহের সর্বসাধারনের জন্য নীতি নির্ধারণী যে নিয়মের বিধান তা কখনই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিল পরে না এ জন্য সমাজ সংসার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত সকল স্তরের বাইরে এই বিধান স্থান করে আছে। একটু দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন ভাবখানী দ্বারা যদি চিন্তা করা যায় তবে তা সবার চোখে কিছুটা ইশারা বা ইঙ্গিত বহন করবে। কারণ জগতের সকল প্রচার মাধ্যম সহ ধর্মীয় যত প্রকার জাগতিক জ্ঞানী-গুণীগণ ধর্মের নির্দেশনা মানব-মানবীদের দিয়ে থাকেন এদেরই প্রচারতব্য নিয়ম বা বিধানগুলি মানব সমাজে স্থান করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কোন প্রচার প্রসার বা ধরবার চিহ্নটুকু পাওয়া যায় না। তারপরও কি এমন অর্জন যা দ্বারা ধর্মের সর্বোচ্চ মূলধারণার অর্জনটুকু অর্জিত হয়ে থাকে এটা কোন নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা তা হয়তবা কালের অবগাহনে স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিনিধির আগমন দ্বারা এই বিধানের মহামানবগণ একদিন গোটা দুনিয়াকে বুঝায়ে দিতে সচেষ্ট হবে। হাদীছে কুদসী ও মেশকাত শরীফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-"খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি"।

অর্থ–আদমকে আমি (আল্লাহ) নিজ সুরাতে সৃষ্টি করি। কিন্তু হাওয়াকে সৃষ্টি কিভাবে করেন তার বর্ণনাকৃত আয়াত চোখে মেলেনি। তাই সুরতের ধারাগুলো কি?

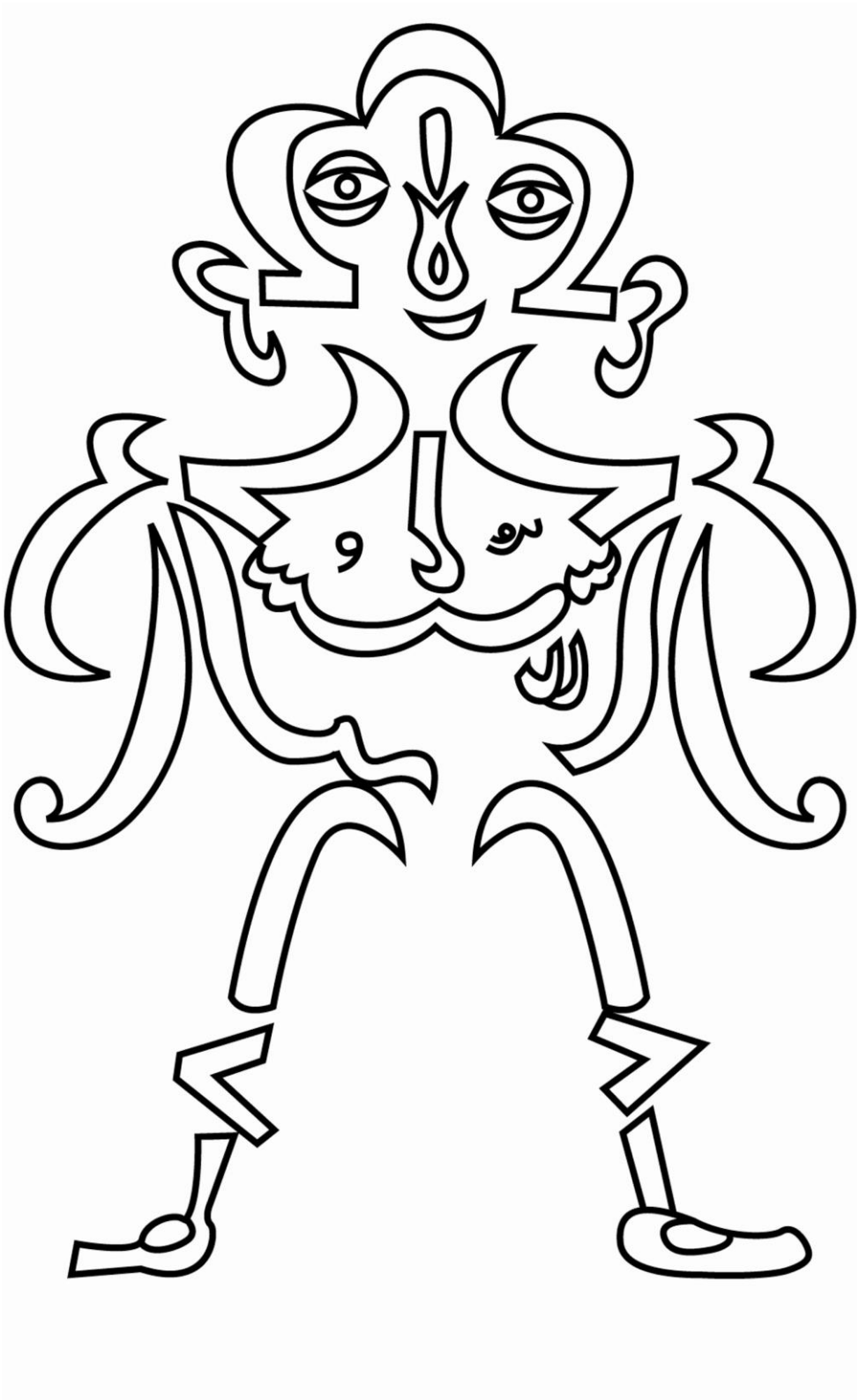

কালাম পাকের ভাব ধারা দ্বারা কোন কোন সাধকগণ এর একটি সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করতে মত প্রকাশ করেন তখন দেখা যায় ধর্মীয় দর্শনে ফতুয়া নামের খর্গ তার ঘাড়ে চাপানো হয় এমন কি জীবন পর্যন্ত দিয়েও এর সুরাহা মেলেনি। সেখানে কোরান বলছে "কুলুর রুহ মিন আমরী রাব্বি"
"আত্মা আমার রবেরই আদেশ হতে আগত"

অন্য আয়াতে সূরা সিজদাহ ৯ আয়াত-"সূম্মা সাওয়াগহু ওয়ানাফাকা ফিহি মিররুহিহি" পরিপূর্ণ-আকৃতি দেন এবং তাঁর (আল্লাহর) আত্মা (রুহ্) তার (মানুষের) মাঝে ফুৎকার করেন"

হাদীস রুহ আমার রবেরই আদেশ নির্দেশ এবং কাজ।

মন্তব্য : আল্লাহ এই মানুষের মধ্যে ফানা হয় বা বিকশিত হয়। এই বিকশিত বা প্রকাশিত রুপ কি এই বিষয়ে সৃষ্টিতে কর্তৃত্ব বহন করে মানুষকে বুঝানো বা জানানোর প্রক্রিয়া বা কৌশল সাধকগণ, ওলিগণ একটি মাধ্যম নামের বিশেষণ অবয়ব ব্যবহার করে থাকেন এই চিত্র কালামপাকের অবয়ব যা দ্বারা মূল দর্শনের কর্তৃত্বের করণতব্য সকল কার্য সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবধারাকে সুনিপুণভাবে সাজিয়ে সঠিক গতি ধারার কার্য যা ঐশী বা আধ্যাত্মিক বলয় দ্বারা কর্মসম্পাদন তব্য করে সাধকদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর কার্যকে ত্বরান্বিত করে থাকে। কেননা এই মূল ধারার বিধানকে বুঝাতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টা জরুরী তা হল নফস এবং রুহ (জীব-আত্মা) ও (পরম আত্মা) এ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান লাভ জরুরী কোন প্রকার ভ্রান্তি বা অমূলক বিষয়ে জ্ঞাত হলে তা দ্বারা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করি। কারণ সূক্ষ্মতা এমনই সূক্ষ্ম বিষয় কি? উদাহারণ হিসাবে উপস্থাপন করি সৃষ্টি জগতে আঁশ জাতীয় কোন উপকরণ যদি ভ্রান্তি থাকে তবুও তা ভিন্নতার দিকে নিয়ে যাবে।

নফসকে সৃষ্টির অন্তরভূক্ত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, আইন বিভাজনকৃত বৈশিষ্ট্য বলে।

সংজ্ঞা, দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অনুভব ও অনুভূতিকে নফস বলে। এই নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে রুহ দ্বারা পরিচালনা করার প্রত্যয় থেকে সফলতা পর্যন্ত পৌঁছানো ধর্মের মূল কাজ হিসাবে বিবেচনা করি। রুহকে স্বয়ং আল্লাহর আদেশ বলে। কোরান রুহ সম্পর্কে অনেক সৌন্দর্যময় অর্থের দ্বারা দৃষ্টিগোচর করা হয়। যেমন ওয়াহেদ, নূরানী মাখলুক, সৃষ্টির বহির্ভূত স্রষ্টা, ইহার মৃত্যু নাই অর্থাৎ আমরণ। সৃজনী শক্তি, সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা, রক্তের কণিকা ইত্যাদি সংজ্ঞা মোহাম্মদী নূরের একটি বিকাশের অবতরণকে রুহ বলে। উহা সৃজনী শক্তির অধিকারী যেমন সূরা বাকারা ৮৭ আয়াত: ইশাকে রুহুল কুদ্দস দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে। অন্য আয়াতে রুহুল কুদ্দুস-স্থান পবিত্রকারী রুহ, অন্য আয়াতে রুহুলকুদ্দুস দ্বারা মমিনকে শক্তিশালী করি। কোরান রুহ বিষয়ে ১৭ বার বিভিন্নভাবে ঘোষণা করেছে। এই রুহই বীজ রুপে সকল মানব মানবীর মাঝে অবস্থান করে এটাকে জাগ্রত করাই সাধকের জন্য মূল কাজ এটাই ধর্মীয় দর্শনের মূল বিষয় বলে মত প্রকাশ করি। আর ইসলামে যত মতভেদ এটা উত্তরণ করে মূলধারায় পৌঁছানো দূরহ। এ জন্য অনেক সময় নিকটের আশেকানদের বলে থাকি সামনে নতুন ধর্ম আসলে তোমরা গ্রহণ করিও দেল মাদেল ধর্ম বাবা গোবাল মা তুবা নন–সামনে আবির্ভাব বিষয়ে ধর্মের ভবিষ্যৎ বাণীটুকো বলি।

পীর বা গুরু
বিষয়ে আলোচনা

"পীর" হল ফার্সি শব্দ, বাংলায় গুরু, আরবীতে অলি মোর্শেদ, এছাড়াও সাকি, সারপ্রোভা, রেনেদা সহ বিভিন্ন ভাষাতে নামকরণ রয়েছে। গুরু হল- অন্ধকার দূরীভূত করে আলোর দিশার সন্ধান দান কারী অভিভাবক। প্রচলিত ব্যবস্থায় যাহাকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়। আধ্যাত্মিক জগত বা বাতনি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সূচনা হল গুরুর নিকট বায়াত গ্রহণ বা আত্মসমর্পণ করা।

এখন কথা হলো অন্ধকার কি? যা দূরীভূত করে আলোর দিশা স্থাপন করবেন। অন্ধকার হল মানবের মধ্যে নিহিত শয়তানী স্বত্ত্বাকে অন্ধকার বলে। শয়তান, ইবলিস, খান্নাস, মরদুদ এই চারটি স্বত্ত্বা একত্রে শয়তানী স্বত্ত্বা বুঝানো হয়ে থাকে। শয়তানী স্বত্ত্বা একটি দেহে ক্রিয়ারত হলে সেই দেহের অধিকারী মানব অন্ধকারভূত,মানব মূল সত্ত্বা হল (রুহ) এর ক্রিয়ায় অচৈতন্য থাকে, ফলে কর্তব্যকর্মের সঠিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে ধর্মের মূল অনুশীলন ব্যবস্থা ব্যহত হয় যা খুবই সুক্ষ্ম বিষয় বা আত্মিক সাধনারত মানবগণ বুঝতে পারে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ খুব কমই দেখা যায়। তাই গুরুর দেওয়া অনুশীলনের মাধ্যমে সে এই শয়তানী স্বত্ত্বাকে একটি দেহ থেকে নিঃস্ক্রীয় করা বা মুসলমান বানানো ইহাই অন্ধকার দূরীভূত বলা হয়।

আলোর দিশা হল (রুহ) প্রতিটি মানব দেহে মাওলা স্বত্ত্বা (রুহ) রূপে বিরাজিত এই রুহকে জাগ্রত করতে পারলেই আলোর দিশা বা দেহের চৈতন্য ঘটে। এমন দেহকেই আলোর দিশা প্রাপ্তির সুসংবাদ দান করে। এই কার্য সম্পাদন করতে কোরআন উছিলা অন্বেষণ করবার, একা হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ জন্য এই নির্দেশনামার বাস্তবিক বা ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যিনি পরিজ্ঞাত তাহাকেই গুরু বলে। যে জ্ঞান দ্বারা এই ব্যবস্থাপত্র পরিচালিত হয় তাহাকে এলমে লাদুনি বলে। এ বিষয়ে পীরানে পীর দস্তগীর মাহ্বুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী গাউসে সামদানী সেখ

সৈয়দ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী বলেছেন, 'যখন পীরের নিকট গমণ করিবে তখন জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।"
মাওলানা জালাল উদ্দিন (রুমি) (রহঃ) বলেছেন, রুম ততক্ষন পর্যন্ত কামেল হতে পারে নি, যতক্ষন পর্যন্ত সামস্-ই-তাব্রিজ এর গোলামী করেছে"। এই হলো গুরু এবং শিষ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা।

একজন মানব মানবীকে প্রকৃত ধর্মীয় বিষয় অনুধাবন করতে গুরু ধরা আবশ্যিক। প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ (রুহ) রূপে বিরাজিত। এই রুহ স্বত্ত্বাই হল প্রকৃত গুরু। এই গুরুর সন্ধান করতে কোরান বিভিন্ন ভাবে উছিলা অনুসন্ধান করবার নির্দেশ দান করেছে। এই উছিলায় আজকের বেলায়েতী ব্যবস্থা, গুরুবাদ বা সূফিজম। প্রচলিত বিধি বিধানের সঙ্গে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়ায় মানুষের বুঝতে কষ্টসাধ্য হতে চলেছে। এছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন দল বা ফেরকাবাজীর উপদল দিন দিন প্রবৃদ্ধি হওয়ার ফলে মানুষ মূলের ধারার অনুশীলন ভূলতে বসেছে। প্রকৃত পক্ষে একজন কামেল গুরুকে চিনতে ও বুঝতে হলে তাঁর দেওয়া "মোরাকাবা" "মোশাহেদা"র মাধ্যমে চেনা জানা সম্ভব। তাই কর্মযজ্ঞ দ্বারা নিজেকে চেনার প্রকৃত বিধান হল গুরুবাদ। ইহাই আহলে বাইয়াতের বা মূলের অনুশীলনগামী ব্যবস্থা। কোন মানুষের একমাত্র চাওয়া স্রষ্টাকে মনে ও প্রাণে লালন করে এর কার্য্যফল ফলাতে গুরুবাদ প্রয়োজন। মেকির বোধোদয় জ্ঞান এবং যুক্তির মানদন্ড এখানে অচল।
এখানে বা এই পথের পাথেয় জ্ঞানকে এলমে লাদুনী বলা হয়।।
"মানুষের জন্য ধর্ম এসেছে-
ধর্মের জন্য মানুষ নয়"
তাই এই মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে পরিগণিত হওয়া এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার সিঁড়িই হলো গুরুবাদ ব্যবস্থা।
এ প্রসঙ্গে মাওলা আলী (আঃ) বলেছেন, যারা আহ্লুল বাইয়াতকে ভালবাসেন তাদেরকে অনেক দুঃখ দুর্দশা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, যন্ত্রনা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এজন্য মানুষ অতিশয় আরাম প্রিয় এবং ভোগবাদীর উপর আকৃষ্ট ভাবটা সর্বদাই দ্রুত কার্যকরী রূপদানে সচেষ্ট হওয়াতে আহলুল বাইয়াত কে গৃহীত চিন্তা চেতনা অমূলক ভাবে এবং এটাকে বাতিল প্রমাণ করতে যুক্তির মানদন্ড দাঁড় করিতেও বিবেকে বাঁধে না।

এ ভাবেই দিনের পর দিন মানুষ প্রকৃত সত্য বিধান থেকে দূরিভূত হতে চলেছে। মূল ধারার বিধান পেতে হলে মানুষকে গুরুবাদ ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে সকল কর্ম মোহগ্রস্থতার বাইরে অবস্থান করে কর্ম সম্পাদন করতে পারলে প্রকৃত গুরুবাদী ব্যবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

মূল ধারার অনুশীলনগামী ব্যবস্থা দ্রুত মানব সমাজে পালনতব্য করার প্রচেষ্টা থাকলেই ধর্মের প্রকৃত সার্থক রূপ মানব সমাজে চির সমুজ্জল ভাবে ফুটে উঠবে। স্রষ্টার সৃষ্টির যথার্থতা এবং ধর্মের প্রকৃত নির্দেশনামা বাস্তবায়ন পূর্ণতা পাবে। এটাই গুরুবাদ ব্যবস্থা।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদ এর নিম্ন লিখিত সূরার আয়াত গুলো অনুধাবন করিতে চেষ্টা করুন।

সূরা ইয়াছিন-২১
সূরা মায়েদাহ-৩৫,৫৫,৫৬
সূরা ফাতেহা-৬,৭
সূরা ফাতাহ- ১০
সূরা আল ইমরান- ৬৮
সূরা নূর- ৩৫
সূরা তওবা- ১১৯
সূরা নেছা- ৬৯
সূরা জাষিয়াহ- ১৮, ১৯, ২০

গান বাজনা বিষয়ে

ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল- সুরেশ্বরী যে দলিল ও যুক্তি দাঁড করিয়েছেন তা মারফতের বাণী নামক পুস্তক খানি পড়লে আন্দাজ করতে পারবেন। আমি কোন কিছু বাড়িয়ে বলেছি কিনা।

গান

(১)

পীর চিনিয়া মুরিদ হও। আত্মার মুক্তির খবর লও
পথে ঘাটে দেশে দেশে ঘুরিসনা আর মিছে মিছে
নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা অন্যরে বুঝাই সদাই ॥
পীর.....ঐ
কাম আর লালসা দিয়ে, খুঁজে বেড়াই মিছে মিছে
আমার ভাগ্য দশা এমন, 'আসলকে' নকল বলা যেমন ॥
পীর ..... ঐ
ছয় রিপুর মোহনায় মিশে, পোশাকী ভদ্রতা ভালবেসে
ভবের নেশায় কাটল বেলা, চোখ থাকিতে সাজলাম কানা ॥
পীর ..... ঐ
বাবা জাহাঙ্গীর ডেকে বলে, দেলোয়ার পাগলা বুঝলি নারে
খেলাফত দেখে মুরিদ হও, মোরাকাবাতে প্রমাণ লও ॥
পীর ..... ঐ

(২)

প্রভু তোমার এ কোন খেলা, আসলকে নকল জানা
ভবের কাবা নিজের কাছে দুর দুরান্তে খুঁজে ফেরে
এই তো প্রমাণ দেহ তত্ত্বে, মিছে খুঁজিস দালান ঘরে।
প্রভু ..... ঐ

মেজাজী আর হাকিকী দুই জ্ঞানের বর্ণনা শুনি
সত্য বলিতে মন উৎগ্রিব, জ্ঞানের বিচারে বলার আদেশ।
ফকির বলে সবই পাবে, নিজ দেহের ভিতরে
মোল্লা মুফতি এক সাথে মিশায়ে বানায় গো চেনা।
প্রভু ..... ঐ

বাবা জাহাঙ্গীর ভেবে বলে, স্বরূপ সাধন বিনে পাবিনে তারে
(আসফালুস সাফেলিন) ছাড়ও কঠোর ভাবে সাধনা করো
দেলোয়ার পাগলার কপাল পোড়া, সাধন করতে খায় তারা
মিছা মিছি ভং দেখাল, চুল আর মুচের বাহাদুরী করল।
প্রভু ..... ঐ

(৩)

নিজকে যদি চিনিতে চাও, মোর্শেদ বাবার স্কুলে যাও ॥
সঠিক গুরু হইলে তোমার, প্রমাণ মিলবে দ্রুততায়।
দেশ বিদেশে বেলায়েতের রাজা, সুরেশ্বরীর দরবার খানা,
নিজকে..... ঐ
মন আমার বেজায় পাঁজি, নিষ্ঠা কর্মে থাকে না রাজি,
কালে যৌবন ভাবিতে গেল, মহাকাল এসে পারোয়ারি দিল ॥
নিজকে ..... ঐ
তোমরা কেহ ভুল করনা নিজকে চিনতে দেরী কর না
বাবা জাহাঙ্গীরকে শিক্ষক মান, ফর্মূলা জেনে মোরাকাবা কর।
নিজকে... ঐ
আর বা আতা আশু রিহিন, কিছু না পেলে গালি দিন,
দেলোয়ার পাগলার কপাল মন্দ, করে বাবার সুনাম ক্ষুণ্ন ॥
নিজকে ..... ঐ

(৪)

কি খেলা খেলছেন সাঁই বরজোখ লীলে,
এ এক অপার মহিমা গুরু কৃপা বলে।
যদি তার দয়া মিলে গো ঘাটে তরী পাবে বটে
সদাই থাকে আনন্দে বেহুঁশ লোকালয়ে ॥
বরজখ খেলার এমনই ধারা, জীবন থাকতে যায় রে মারা
সদা নিরিখ নিরুপণ হইলে, মজা পাইবে সাধনার বলে
মর্ম যদি বুঝা যায় মাকাম ঘাটের দ্বার খুলতে লাগে না কোন উপায় ॥ ঐ
দেহের চেতন হইলে তোমার, ঘাটে ঘাটে আনন্দের শয্যা ফোটে
ভিতর মাঝে রহস্য রাখছে সাঁইজি আমার মাহমুদা মাকামে
এ খেলা জানতে চাইলে ধর চেপে রূপ নিহার নছিরাতে ॥ ঐ
বাবা জাহাঙ্গীর ডেকে বলে, পাগলা তুই আর বলিসনে
ধ্যানে থাক 'কুলুপ' এঁটে, দেখে নাও তাঁর খেলা কিসে
মানুষ ছাড়া নাইরে খেলা প্রকাশ হলে, কাফের শালা ॥ ঐ
ভবের মায়ায় ডুবে রইলাম, রঙ্গ রসে কাল কাটাইলাম
গুরু ভক্তি আঁকড়ে ধরলে হুঁশ থাকে না পাগল বলে
দেলোয়ার পাগলার মিছা-মিছিতে কাল গেল ফুরায়ে ॥
..... ঐ

(৫)

মহরম

বছর ঘুরে এলরে ঐ মহরম, সাধু সন্যাস অলী যত
নিশ্চুপ শোকের মাতম হৃদয় পটে করে আলিঙ্গন
বলতে পারে না তারা জাতের মূল ধারা ॥

বিজারিত সব মতবাদ বলতে হবে নিপাত যাক
মহিনীর ছোবল এসে ঢেকে দিয়েছে সত্য টাকে
এর থেকে উৎগীরণ কবে করবে জ্ঞানীগণ ॥

মহিয়ান গোরীয়ান যিনি দেখিয়েছে কারবালায় তিনি
হারানোর ভয় দুরে ঠেলে সত্য মিথ্যার তফাৎটা দেখিয়েছে
এ এক করুণ আজব রীতি সদা জাগ্রত বিশ্ব বিধাত্রী ॥

কি দিয়ে বোঝাব মোরে কানা কি নয়ন মেলে
গুণী জনের বারিধারা দেখে মন উতালা
বুঝিনা কভূ কিছু বোঝাই তোদের মিছে ॥

নাম না জানিয়ে --- দুধের শিশু হাহাকারে ফোকাল
তীর বিধীল তাঁহার গায়ে রক্তের উৎগীরণ মরুতে
আকাশ বাতাস প্রকম্পিত দমিয়ে রাখলে আর্ত গোপনে ॥

অবশেষে বলা বলিতে জানিয়ে দিলে তফাৎটাতে
মস্তক ছেদন সম্মতিদানে ইহা কি সবাই বুঝিবে?
স'বেরীন নিশানাটাতে জানাওনি হোসাইন তুমি কে?

সৃষ্টির সকল মানব মানবীর পা দুটো মাথায় নিয়ে
এত ক্ষুদ্রের জবাব হয় না তবুও অন্বেষণ করি
জবানে বলি ইয়া হোসাইন, ইয়া হোসাইন, ইয়া হোসাইন (আঃ) ॥

(৬)

মহরম

এল মহরম সবাইকে জানাতে
পঠিত জ্ঞানদ্বারা ধর্মের মূল ধারা রবেনা
গুপ্ত ভেদের জনক যারা কালে কালে দেখায় তারা
প্রাণ স্বত্বা হারানোর ভয় কভূ করেনি তারা ॥

কেহ দেখে ভূলে যায় কেহ রাখে হৃদয় পটে
সভ্যতাকে জাগাবে বটে অনুকম্পা সদয় লুটে
ভাবিনির গতি ধারা মূল আদর্শ নেওয়া ছাড়া
হইবে না তোর জাতের ধারা বেহুঁশ হলে জগত পটে ॥

মস্তক ছেদন কে করিল জানলে কেহ বলে না কভূ
মূলের ধারা তাঁরই খেলা হচ্ছে হবে মানুষ মাঝে
এইতো মোদের অজ্ঞ স্বভাব দূর হয় না তারই নামা
দেখিয়ে যায় পূর্ণ করে মানুষ মাঝে সর্বকালে ॥

পাক পাঞ্জাতন মূল ধারা বাইরে নাই কেহ তাঁরা
বিনোদ কালা রাখেন ঢেকে দীনের পর্দা আবরণে
অজ্ঞ যারা হারায় তারা মূল তখন যায় চলে
হোসাইনের বানী স্মরণ করে মহরমে শিক্ষা নিবে ॥

আইছ একা যাবে একা কি করলে সময়টাতে
ভিতর মাঝে তাঁরই উদয় করতে হবে নিপুণ ভাবে
দেহের কার্য পূর্ণ করে দেখায় বাবা হোসাইনে
মহরম মহরম শুনলে ধ্বনি হোসাইন হোসাইন বলবে তুমি ॥

(৭)
মারফতি

তন্ময় তনু গোকুলে বাড়া
গোড়ামীতে তন্ত্র ছাড়া
গোধুলি আসিয়া জমিছে রণে
খনজন্মার একি হাল রণে ॥

রমণ ঠেলিয়া কহিছে স্বত্ত্বা
মণন পায় কভূ ধুত
ধরণী আচানক মন্ত্রে গিয়া
মদন রণিছে আবলীলা ॥

শিখা দাঁড়িয়েছে নিরঞ্জনে
শিষ্য শিষ্টতা রেখেছে ভবে
আব আতশ খাক বাদ
শিখা অনির্বাণ নিরুপণ ॥

শুল্ক সে তো রমণ তলে
বার নারী একই কারে
কার্যসিদ্ধ পূর্ণ করে
হাতিয়ে নেয় শ্রুতি মাধুর্যে ॥

ঢং টং টং বং গং নাই
কাইদা শুধু মন অতলে
খেলছে খেলা ভিতর আলা
সবার মাঝে একই প্রকারে ॥

(৮)
বাস্তবতা

ভেদ না জেনে গোল বাঁধিয়ে কি লাভ মাওলানা
পরপারে নিকাশ দিতে তোমায় কিন্তু ছাড়বে না
মওলার না হয়ে হয়েছো তুমি মাওলানা এহেন
কার্য তোমার হলে জগত ডুববে আঁধারে ॥

মওলা পেতে ওকিলা কোরান বলে ভূল না
তাইতো মোদের জীর্ণ আর শীর্ণ কর কোরান বানী দুরে রেখে
চালাও তোমার চাটুকারীতা আল্লাহ রসূল ভূলে
এইতো মোদের ধর্ম শিক্ষা দিয়ে চলেছে সবখানে ॥

মর্ম কথা বলবো কি আর ধর্ম পেতে গুরু ভজ
এই রহস্য জানতে পাবে মওলা তোমায় সাথে নিলে
শরার বচন দমিয়ে রাখ মূল কার্য্য আঁকড়ে ধর
গুরুর দয়ায় পাবে স্নিগ্ধ ভূবন মাঝে প্রকাশ হবে ॥

লেবাস দিয়ে ধর্ম চলে সত্য কিন্তু বলে নারে
হাজী সেজে মক্কা থেকে ডিগ্রী আনে তাম্বরী নিয়ে
এহেন ধর্ম তোমার সম্পদ মওলার বিধান কৈ থাকে
ভ্রান্তির মাঝে ফেলেছে মোদের উদ্ধারিতে বিপত্তি কষে ॥

উছিলা ছাড়া বিধান কি আর মিলবে তবে দেহ মাঝে
আত্মার মুক্তি গুরু শিক্ষা মূল বিধান জাহাঙ্গীর বলে
তকদীর ব্যাটা বাঁধ সেজেছে গুরু কার্য দূরে হটাতে
মিথ্যার কাছে পরাভূত দেলোয়ার পাগলার সম্বল হল ॥ ঐ

(৯)

মুমুক্ষা

হইলনা মোর স্বভাব সুন্দর
স্বভাবেতে মন বেজার
কম পড়েছে সাধন সিদ্ধি
বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পেয়েছে।
আগা কেটে মুসলীম হওয়া
নারীর বিধান ঢেকে রেখেছে ॥

ধর্ম কর্ম সব করতে
চালু দিলাম আমল কষে
সবাই তখন ভাল বলে
মেলে না মোর হৃদয় পটে
শিখায় যারা দেখায় তারা
বিধান খুঁজলে উল্টা লাগে ॥

ছাড়লাম ভবে দেখানো প্রথা
খুঁজব এবার কালাম কথা
বাঁধ সাধে সকল ব্যাটা
আমার জ্বালা বোঝে না কেউ ?
খুঁজতে গিয়ে পীরের পায়ে
সে বলে অটল নীতি দুর্বল প্রেমে ॥

সাধন সিদ্ধ প্রেমের গীতি
ধৈর্য্য হারা হইলাম তবে
পাঠশালা নাই নর নারী
মিলন করতে প্রেমের জুড়ি
সাধুর দ্বারে দ্বারে অমর বানী
চুপ থাক আধ্যাত্মিকে ॥

ভিতর আলা পাঠায় কালাম
উপযুক্ততা প্রমান করে
তারই মুখে ধর্মের বানী
পূর্ণতা পাবে কোরআন খানি
ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করি
অজ্ঞতা ঘেরা আঁধারী ॥

মর তুমি আত্মশুদ্ধিতে
তাতেও তোমার তৃপ্তি থাকে
মন ব্যাটা বোঝে নারে
স্বভাবেতে দোষ পড়ে
কলেমাতে সব রয়েছে
থিসিস কর নিপুণভাবে ॥

পূর্ণ কলেমা চব্বিশ হরফ
বারটিতে মূলের ধারা
বারটিতে বদল করা
ইহাতে নাই কোন ফোটা
ইহাই হলো প্রেমের ধারা
অমর প্রেম একেই বলে ॥

কলেমার তাহ্কিক দেখায় রাসূল
আহলুস সুফফা তাঁরই নিদর্শণ
চাঁদের কিরণে, ফুলের সুবাসে
মলয়ের প্রহসনে নদীর কল্লোলে
সাগরের কলরবে, বনের মর্মরে
পাহাড়ের কঙ্করে এমন কি
মৃত্যুর অন্তরালেও লুকিয়ে থাকে প্রেম ॥

(১০)

গান ঃ

না জেনে কালাম পাক
দায় হল ভাববাদ
বলছি মুখে আল্লাহ্ গনি
ভিতর মাঝে জাগেনা কিছু ॥

মুখে মুখে আল্লাহ্ বলা
নেক হবে অনেক পালা
আলেমগণে বলছে ভালো
আল্লাহ্ না শয়তান শোনে ॥
এ প্রশ্ন রাখি কারে? ঐ

আল্লাহ্ যদি শুনবে তবে
সূরা মোমিনের ৬০ আয়াতে
বলছেন মাবুদ একা হতে
একা হবার উপায় কি জানাবে?

(আল+লা) দুই এর যোগ করা
এই যদি হয় পূর্ণতা
দেহের গঠন হা' দ্বারা
ফ্যার পল ভবের ধারা
মিলায়ে দেবে আলেম তারা ॥

পীর বলেছে শয়তান তারা
করিসনা আর সময় হারা
রিপুর ঘানি টেনে টেনে
বৃথা সময় পার করিলে ॥
আমি কি আর নেব তোরে- ঐ

মানতে হবে পীরের কথা
তাড়িয়ে বেড়ায় বোঝেনা যারা
দেলোয়ার পাগলার ঢংবাজিতে
অমর সময় যায় ॥
দুইয়ের মিল বুঝা ভার
কি করি উপায় ?

মোর্শেদ কর্তৃক প্রদত্ত
সালাম, সাজরা, অজিফা,
পাঠঅন্তে প্রার্থনা মোনাজাত
প্রার্থনা
"সকল প্রসংসা আল্লাহর"

ইয়া ইলাহী, প্রণয় করি
সাল্লাল্লাহু আলাইকা, সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম
সালাম জানাই পাক পাঞ্জাতন, স্মরণ করি ঈমামগণ
সিলসিলাকে সামনে রেখে নত শিরে জাহাঙ্গীর নাম
আহলে বাইত তোমার বিধান জারী করে
উঠায়ে নিলে হাবীবকে নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ॥

ইয়া এলাহী,
মর্মস্পর্শী রুবুবিয়াতের স্তর থেকে উর্ধ্বগামী
সকল স্তরকে সুশোভিত স্তর করে রেখেছ
আর নিম্নগামী প্রহেলিকায় ত্বরান্বিত করেছ
কত দাসকেই প্রেরণ করেছ ত্বরাইতে
সফলতা দিয়েছে সামান্য
সকল (মানব-মানবীর) অজ্ঞতা আমাকে দাও
আর হেফাজত তুমি নাও ॥

ইয়া এলাহী,
আহাদ, আহম্মদ, মুহাম্মদ, আবাদান
সকল কর্তৃক একত্র করণে
পূর্ণতার ঘোষণা দিলে
(মানব-মানবী) কিয়দংশ টেনে
গাফেল হতে চলেছে বিধানে
গাফেল টুকো আমায় দাও
কল্যাণ সুনিশ্চিত করে দাও ॥

ইয়া এলাহী,
কলেমার মর্ম তুমি,
ভেদের বয়ান তোমায় বলি
কালিমা লেপন কল্প বিধানে
সাবেত ধারায় জানলে.....॥

রহিল আজি নত শিরে আর্জি
অমানুষকে মানুষ করে দাও
নফছের জিহাদ ত্বরান্বিত কর
দাসগণের শিক্ষা বেগবান কর
আত্মার মুক্তি তোমার তোমারই
তোমারই দ্বারে ফরিয়াদ
ইয়াজুল জালালুহুল ইকরাম ॥

স্বভাবে সূরত
- Self

শোন মন তোরে বলি
আপন সূরতে সমাক্রান্ত হবি
করিলে পরছিদ্রান্বেষণ হইবি
তখন বানর রুপের জনম ॥

করিবে উৎকোচ অবৈধ উপার্জন
পাইবি তখন শুকুর রুপ জনম
সুদখোর তুমি বাদুর সমান
পা উপরে মুখ নিচে আকার সার ॥

হও তুমি অন্যায় বিচার কারী
রয়েছে যত আদেশধারী
অন্ধ রূপে জনম তোমার বরাবরী
সতর্ক হও (মন-জ্ঞান) তোমায় বলি ॥

মিথ্যা হাদীস বর্ননা কারী
উপার্জন করে অর্থ কড়ি
এমন জনম হবে রে মন
থাকবে না তার মুখের মাংস
রুপটা কি?

স্বীয় সৎ কার্য গৌরব থাকিলে
বোবা হয়ে সৃজন হবে
অহংকার ও আত্মগরিমা হলে
কঠিন দুর্দশার জনম হবে ॥

হায়রে মন গীবত কারী
ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ নিকৃষ্ট জনম
জগত বিধানে চোরা কারবারী
হাত নেই সুরত কি? ॥

স্বীয় কর্ম না করে তুমি
আদেশ দানে ব্রতী হলে
জিহবা পড়বে বুকেতে
বাহির হবে রক্ত পুঁজ
আকারটা কি? ॥

কারো গুপ্ত কথা অত্যাচারীর
নিকট প্রকাশে ক্ষতি হলে
চড়বে তুমি অগ্নিময় শূলে
জাতীর উৎপীরণ পা হারানো ॥

সাবধান হও মন আমার
এমন কার্য্য উদয় চৈতন্য
না ঘটে প্রভূ নিরঞ্জণ সাঁই
এর কাছে আরাধনা রেখে সমর্পন ॥

“আহাদ বা এককের আর্জি”

আত্ম প্রত্যয়

আল্লাহর যত নাম রয়েছে
সকল নামের ফল দাঁড়িয়েছে
ভিন্ন নামের ভিন্ন ফল
অবস্থান তবে এক বল ক্যান ॥

ভাবতে বললে তিড়িং বিড়িং
ধর্মে যেন বাঁধা রয়েছে
শরায় শিখায় এক আল্লায়
কি করে তাহা সৃজন হয় ॥

ভাবখানা মোর মনে উদয়
প্রভু নিরঞ্জণ সাঁই বলেন, আহাদ
আহাদ স্বত্ত্বা পরিশুদ্ধ হবে
সয়ম্ভু স্বত্ত্বা কারে বলে ॥

মুখের পেঁচাল দূরে রাখা
রুপ খানা দেখত ব্যাটা
মায়ের দ্বারে ভক্তি রেখে
বিনয় করে জানতে চাই যে...॥

স্বয়ম্ভু স্বত্ত্বা জানব যখন
সারোৎসার কার্য্য সম্পন্ন তখন
সুরেশ্বরীর দয়া হলে
মা একটা ব্যবস্থা নিবে ॥

এ সব আলাপ কেউ শুন না
ধর্মের দোহাই আর দেব না
ধর্ম যায় রসাতলে
প্রতিনিধিগণ ঝগড়া করে ॥

সকাল সাঁঝে আল্লাহ্ আল্লাহ্
ক্বলব্ জারী রেখ বান্দা
আহাদ স্বত্ত্বা জানবে ভবে
নিশ্চুপ হবে ভূবন মাঝে ॥

এখলাস হলো এককের বয়ান
ভুলেও কেহ তালাশ করে না
মহিয়ান, গরিয়ান, সুপ্রভ তিনি
দেলোয়ারের বিফল স্বয়ম সায়ন্তন ॥

বিঃ দ্রঃ- আরবীতে ওয়াহেদ অর্থ- এক, আহাদ অর্থ- একক

হাদীস

❖ যে ব্যাক্তি দুনিয়া তলব করে সে হিজরা অর্থাৎ (পুরুষ ও নয় স্ত্রীও নয়), যে ব্যাক্তি জান্নাত তলব করে সে আওরত, যে ব্যক্তি খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ।

= আল হাদীস

❖ মারেফত না জানিলে আল্লাহ তা'লা এবাদত বন্দেগী (তপজপ) কবুল করিবেন না। যদি কেহ হাজার বছর এবদত বা সাধনা করে তবুও বাতেনী এবাদত (গুপ্ত সাধন) ব্যতীত কবুল হইবে না।

= আল হাদীস

হাদীসে কুদসী

= রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলিয়াছেন, কাল্‌বে আছে ফুয়াদ (অনুভূতি-গতিপ্রবাহ), ফুয়াদে আছে রুহ অর্থাৎ ফুয়াদকে ঠিকভাবে পরিচালনা করিলে উহার রুহ প্রাপ্তি ঘটে। রুহের মধ্যে আছে সের (সের অর্থ রহস্য) সেরের মধ্যে আছে নূর(নূরে মোহাম্মদী) নূরের মধ্যে আছে আনা (আনা অর্থ আমি) আল্লাহ বলেন নূরের মধ্যে শুধুই আমি আছি।

বানী

❖ নিজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি অন্যের জন্য যা অপছন্দ করবে তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

= মাওলা আলী (আঃ)

❖ কেয়ামতের দিন যে বস্তু মানুষকে বেহেস্তে নিয়ে যাবে তাহা হইল যোহদ এলম নহে।

❖ সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মানুষের উপর ফরজ করা হইয়াছে তাহা হইল মারেফত।

❖ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক যার অন্তর ইহকাল ও পরকালের সকল আশা ত্যাগ করিয়া একমাত্র মাহবুবের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

❖ সবচাইতে নিকৃষ্ট সহচর সে, যার জন্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। = মাওলা আলী (আঃ)

❖ আহলুল বাইত কে যারা ভালবাসে তাদেরকে অনেক দুঃখ দুর্দশা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-উৎপীড়ন-যন্ত্রণা পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে- = মাওলা আলী (আঃ)

বানী

❖ মোর্শেদ হাসরের গতি খলিফা নবী শত নবীর সাথী নহে, কিন্তু নিজ পীর।- জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী

❖ ক্ষেত্র বিশেষে ভাল সাজা সহজ কিন্তু সর্ব অবয়বে ভাল হওয়া কঠিন।

❖ যারা সত্যকে গোপন করে মিথ্যার উপর পরিচালিত হয় এরা পশুর চাইতেও অধম। দুনিয়াতে এদের দৃষ্টান্ত থাকবে, পরকাল হারাবে।

❖ তুমি যা জাননা সে বিষয়ে পরামর্শ দানে চুপ থাকা শ্রেয়।

❖ কারো কাছে কিছু শিখলে জ্ঞান দ্বারা তা নিরিক্ষা অন্তে গ্রহন করিও। ইহা সচেতন নাগরিকের বা মানবের বৈশিষ্ট্য।

❖ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো সততা আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তোমার একমাত্র কার্য্য।

❖ যাদের বিবেক মৃত তাদেরকে পরিহার করে চলাই শ্রেয়, সত্য সুন্দরকে কুলষিত করতে এরা পিছুপা হয় না।

❖ নিরিখ, বরযোখ, তাসাববুরে শায়েখ পীরে লীন হওয়াটাই ফকিরী।

❖ মানুষ ফকিরের যোগ্য তখনই হয় যখন তাহার মধ্যে এই অস্থায়ী জগতের কোন কিছু স্থায়ী না থাকে। (খাজা বাবা)

যাদের সহযোগিতা এবং এক নিষ্ঠতায় আমার প্রেরণা জুগিয়েছে এ জন্য পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরেছি।

- মাওলানা আবুল বাশার, সিলেট।

(১)জনাব সুজন চিশ্‌তী রাধানগর, পাবনা।
(২)জনাব রইজ উদ্দিন, সোনাপট্টি, পাবনা।
(৩) মোঃ শাহ আলাম, কিসমতপ্রতাপপুর, পাবনা।
(৪) মোঃ ছানা চিশ্‌তী, ঝাউতলা রোড, গোপালপুর, পাবনা।
(৫) মোঃ মজিদ আলী, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৬) মোঃ কুতুব বিশ্বাস, কয়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৭) হাফেজ মোঃ রবিউল ইসলাম, বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৮) মোঃ সালাম প্রাং, বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৯) মোঃ ওহিদুল কায়েমকোলা, দোগাছী ,পাবনা।
(১০) মোঃ লিপটন, খয়েরসুতী, দোগাছী,পাবনা।
(১১) মোঃ আনিছ, খয়েরসুতী, দোগাছী, পাবনা।
(১২) মোঃ রেজাউল করিম, ইসলামপুর, ঢাকা।
(১৩) মোঃ আলম, খয়েরসুতী, দোগাছী, পাবনা।
(১৪) মোঃ হোসেন, কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৫) মোঃ সুরুজ, কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৬) মোঃ রাজ্জাক, কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৭) মোঃ আব্দুল গফফার, (ভূমিকা প্রণেতা) কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৮) মোঃ সালাম, দোগাছী, পাবনা।
(১৯) মোঃ জাহাঙ্গীর, দোগাছী, পাবনা।
(২০) মোঃ সাইদুল, দোগাছী, পাবনা।
(২১) মোঃ জুয়েল, বলরামপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২২) মোঃ মজিদ, পিঁপড়িয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৩) মোঃ মান্নান, পিঁপড়িয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৪) আহাম্মদ, পিঁপড়িয়া, দোগাছী, পাবনা।

(২৫) মোঃ মুক্তার হাজাম, লাছিপাড়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৬) মোঃ শরীফ, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২৭) মোঃ শাহিন, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২৮) মোঃ আতিয়ার, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২৯) মোঃ শুকুর, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩০) মোঃ আনিস, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩১) মোঃ ফিরোজ, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩২) মোঃ আরিফ, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩৩) মোঃ আমজাদ, বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৩৪) মোঃ ইবাইদুল, চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৩৫) মোঃ হান্নান, চক দুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৩৬) মোঃ শাহীন, সুজানগর, পাবনা।
(৩৭) মোঃ গুলজার হোসেন, নওগাঁ
(৩৮) মোঃ রিপন, দোগাছী, পাবনা।
(৩৯) মোঃ আইয়ুব, দোগাছী, পাবনা।
(৪০) মোঃ মিলন, বাবুলচারা, গয়েশপুর, পাবনা।
(৪১) মোঃ বাবুল বিশ্বাস, দোগাছী, পাবনা।
(৪২) মোছাঃ নাজমা খাতুন, কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৪৩) মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৪৪) মোছাঃ রেশমি, কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৪৫) মোছাঃ সাবিনা, বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৪৬) মোছাঃ আম্বিয়া, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৪৭) মোছাঃ সুরাইয়া, মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৪৮) মোছাঃ ফাতেমা, রাজাপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৪৯) মোছাঃ সোনিয়া, কুলনিয়া, দোগাছী,পাবনা।
(৫০) মোছাঃ লিপি খাতুন, বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৫১) মোছাঃ সেলিনা খাতুন, কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া গুরু বাদের একমাত্র কাজ

ইঞ্জিঃ বাবা দেলোয়ার হোসেন বা-গোলামে জাহাঙ্গীর আল্ সুরেশ্বরী।

বি:দ্রঃ বিবৃতিতে সংকলিত কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রত্যাশা রইল।